সহজ ফিকহ শিক্ষা

رسالة في الفقه الميسر

<বাঙালি - Bengal - بنغالي >

ড. সালিহ ইবন গানিম আস-সাদলান

অনুবাদক: আব্দুল্লাহ আল মামুন আল-আযহারী

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

رسالة في الفقه الميسر

د/ صالح بن غانم السدلان

ترجمة: عبد الله المأمون الأزهري

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচিপত্র

ভূমিকা

ফিকহী উত্তরাধিকারের মর্যাদা ও মুসলিমদের অন্তরে এর সম্মান সুদৃঢ়করণ

ফিকহী উত্তরাধিকারের গুরুত্ব:

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর, দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যার পরে আর কোনো নবী আসবেন না। অতঃপর....

এ কথা সকলেরই অবগত যে, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইলমে ফিকহের পরিপূর্ণ মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। কেননা এটি এমন একটি মূলনীতি যার দ্বারা মুসলিম তার কাজটি হালাল নাকি হারাম, শুদ্ধ নাকি অশুদ্ধ পরিমাপ করে। সর্বযুগে মুসলিমরা তাদের কাজ-কর্মের হালাল, হারাম, সহীহ, ফাসিদ ইত্যাদি হুকুম জানতে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন, চাই তা আল্লাহর হক সম্পর্কিত হোক বা বান্দার হক সম্পর্কিত, হোক তা নিকটাত্মীয়ের হক বা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের হক, শত্রু হোক আর মিত্র, শাসক হোক বা শাসিত, মুসলিম হোক বা অমুসলিম। এসব অধিকার ও এর বিধান ফিকহের জ্ঞান ছাড়া জানা সম্ভবপর নয়। আর সেটা হবে এমন ফিকহশাস্ত্র যা বান্দাকে তার কর্মকাণ্ডসমূহের বিধান জানায়, চাই তা কোনো কিছু করা কিংবা না করার চাহিদাজনিত বিষয় হোক, নয়তো কোনো কিছু করা কিংবা না করার সুযোগ সম্বলিত হোক, অথবা কোনো কিছুর কার্যকারণ নির্ধারণ সংক্রান্ত হোক।

যেহেতু অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মতোই ফিকহ শাস্ত্রও বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে প্রসারিত ও বর্ধিত হয়, আর অবমূল্যায়ন ও অপ্রয়োগের কারণে নিস্তেজ ও হারিয়ে যায়; সেহেতু এ শাস্ত্রও যুগের পরিক্রমায় অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে লালিতপালিত ও বর্ধিত হয়েছে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্র ব্যাপ্ত করেছে। অতঃপর সময়ের আবর্তনে এ শাস্ত্রটির ওপর দিয়ে এক দুঃসময় বয়ে চলে। এক সময় শাস্ত্রটির বৃদ্ধি ও পথচলা থেমে যায় বা থেমে যাওয়ার উপক্রম হয়। হয়ত

এটিকে ইচ্ছাকৃতভাবেই এড়িয়ে যেতো বা জীবনের অনেক ক্ষেত্রে এটিকে অবহেলা করা হতো। কেননা তখন ইসলামী রাষ্ট্রে আকীদা, রীতিনীতি ও প্রথার ক্ষেত্রে মানব রচিত অন্যান্য আইন চর্চা ও প্রয়োগ করা হতো। ফলে তাদের জীবন দুর্বিষহ ও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে এবং তারা নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পরে। যদিও এ মহামূল্যবান জ্ঞানের (ফিকহ শাস্ত্রের) মৌলিক শক্তি ও বুনিয়াদী ভিত্তির কারণে যুগে যুগে স্বীয় মহিমায় উজ্জীবিত ও দৃঢ়প্রতিরোধক ছিল। আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের অসচেতনতা ও ঘুমের পরে পুনঃজাগরণ ও সচেতন করলেন এবং তাদেরকে ইসলামের আঙ্গিনায় শরী'আত ও এর বাস্তবায়নে ফিরে আসতে উৎসাহিত ও তাওফিক দান করলেন।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ইসলামী বিশ্বের অনেকেই আল্লাহর শরী'আতের দিকে ফিরে আসতে ও মানব রচিত আইনে বলবত না থাকতে আহ্বান করেছেন। তথাপিও কিছু লোক তাদের রচিত জীবন ব্যবস্থায় নিজেদেরকে পরিচালিত করছে এবং তাদের দেওয়া পথে চলছে; কিন্তু আল্লাহ অচিরেই তার এ দীনকে বিজয়ী করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

তাহলে ফিকহ শাস্ত্র কখন শুরু হয়, এ শাস্ত্র আবির্ভাবের কারণ কী, এর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য কী, এ শাস্ত্রের প্রতি মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী ইত্যাদি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় থেকেই এবং সাহাবীগণের যুগে ফিকহ শাস্ত্র ধীরে ধীরে শুরু হয়। মানব জীবনের নতুন নতুন ঘটনার বিধি-বিধান জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভবই খুব শীঘ্র সাহাবীণেগর মধ্যে এ শাস্ত্র আবির্ভাবের অন্যতম কারণ। মানুষের সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে, একের ওপর অন্যের অধিকার জানতে, নতুন সুযোগ সুবিধার সমাধান অবগত হতে এবং হঠাৎ আপতিত সমস্যার সামাধান বের করতে সর্বযুগেই ফিকহের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান।

ফিকহী উত্তরাধিকারের মর্যাদা ও এর বৈশিষ্ট্য:

ইসলামী ফিকহ শাস্ত্র অন্যান্য শাস্ত্র থেকে বেশ কিছু অনন্য বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো:

১- ইসলামী ফিকহর মূল হলো আল্লাহ প্রদত্ত অহী:

হ্যাঁ, ইসলামী ফিকহ অন্যান্য শাস্ত্র থেকে আলাদা। কেননা এর মূল উৎস হলো আল্লাহর অহী, যা কুরআন ও সুন্নার মাধ্যমে এসেছে। অতএব, প্রত্যেক মুজতাহিদই আবদ্ধ ও আদিষ্ট হয়েছে এ দু'টি মূল উৎস থেকে শরী'আতের বিধান উদ্ভাবন করতে। অথবা এ দু'টি থেকে সরাসরি উদ্ভাবিত শাখা উৎসসমূহ থেকে, অথবা শরী'আতের রূহ মৌলিক দাবীর চাহিদা থেকে, অথবা শরী'আতের সাধারণ মাকাসিদ বা উদ্দেশ্য থেকে, অথবা শরী'আতের মৌলিক নীতিমালা থেকে। এভাবেই এ শাস্ত্রটি তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করতে, এর নিয়মনীতি ও মূলনীতি পূর্ণ করতে উৎপত্তিগত পূর্ণতা, ভিত্তিগত মজবুতি, দৃঢ় খুঁটিগত অবস্থানসহ অহী নাযিলের সময়কাল থেকেই স্বমহিমায় বিকশিত হয়ে আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا﴾ [المائدة: ٣]

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নি'আমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে"। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩]

অতএব, এ ঘোষণার পরে মানুষের প্রয়োজন অনুসারে শরী'আতের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহার ও প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট রইলো না।

২- ইসলামী ফিকহ জীবনের সর্বক্ষেত্র পরিব্যপ্ত:

ইসলামী ফিকহ মানব জীবনের তিনটি ক্ষেত্র শামিল করে। তা হলো: তার রবের সাথে তার সম্পর্ক, তার নিজের সাথে তার সম্পর্ক এবং সমাজের সাথে তার সম্পর্ক। কেননা ইসলামী ফিকহ দুনিয়া ও আখিরাতের, দীন ও রাষ্ট্রের, সকল মানব জাতির এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী। অতএব, এর সমস্ত বিধান আকীদা, ইবাদাত, আখলাক ও লেনদেন ইত্যাদি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রাখে; যাতে মানুষের অন্তরকে জাগ্রত করতে পারে, স্বীয় কর্তব্যের অনুভূতিকে সজাগ করতে পারে, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহর তত্ত্বাবধান অনুধাবন করতে পারে। সন্তুষ্ট ও প্রশান্তচিত্তে অন্যের অধিকারকে সম্মান করতে পারে। ঈমান, সৌভাগ্য, স্থিতিশীলতা, ব্যক্তিগত ও সাধারণ জীবন সুগঠিত করতে পারে এবং সমস্ত পৃথিবীকে সুখী ও সমৃদ্ধি করতে পারে।

এ সব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ইসলামের ব্যবহারিক বিধি-বিধান (ফিকহ) অর্থাৎ মানুষের কথা, কাজ, চুক্তি ও লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত বিধি-বিধানকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

প্রথমত: ইবাদত সম্পর্কিত বিধি-বিধান: যেমন, ত্বহারাত, সালাত, সিয়াম, হজ, যাকাত, মানত ইত্যাদি যা আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক সুসংগঠিত করে।

দ্বিতীয়ত: লেনদেন সম্পর্কিত বিধি-বিধান: যেমন, বেচাকেনা, লেনদেন, শাস্তি, অপরাধ, জমানত ইত্যাদি যা মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক সুবিন্যাস করে, চাই তারা ব্যক্তি হোক বা সমষ্টি। এ ধরণের বিধি-বিধান নিম্নোক্ত কয়েক প্রকারে বিভক্ত:

ক- ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন: সেগুলো হচ্ছে পারিবারিক আইন। মানুষের পারিবারিক জীবনের শুরু থেকে শেষ বিদায় পর্যন্ত যা কিছু দরকার যেমন, বিয়ে-শাদী, তালাক, বংশ, ভরণ-পোষণ ও মিরাস ইত্যাদি। এ আইনের উদ্দেশ্য হলো দাম্পত্য জীবন ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক গঠন।

খ- নাগরিক আইন: এ আইন মানুষের একজনের সাথে অন্যের লেনদেন ও আদান-প্রদানের সাথে সম্পর্কিত। যেমন, বেচাকেনা, ধার, বন্ধক, জামিন, অংশীদারিত্ব, ঋণ প্রদান ও গ্রহণ ও অঙ্গিকার পূরণ ইত্যাদি। এ আইনের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও অধিকার সংরক্ষণ।

গ- ফৌজদারি আইন: মানুষের অপরাধ এবং এর সাজা সম্পর্কিত আইন। এ আইনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জীবন, সম্পদ, সম্মান ও অধিকার সংরক্ষণ করা। এ ছাড়া অপরাধীকে অপরাধের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন এবং এর দ্বারা সমস্ত মানুষকে অপরাধের শাস্তির পরিণতির ভীতি দেখানো, সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এ আইনের অন্যতম লক্ষ্য।

ঘ- নাগরিকের কাজ-কর্ম ও অপরাধ উপস্থাপন সম্পর্কিত আইন (বিচার): এটি বিচার ও আইন, বাদী বা বিবাদীর দাবী, সাক্ষ্য প্রমাণ, শপথ ও আলামত ইত্যাদির মাধ্যমে তা প্রমাণ প্রভৃতি সম্পর্কিত আইন-কানূন। এ আইনে লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

ঙ- সাংবিধানিক আইন: রাষ্ট্র পরিচালনা ও এর নিয়মনীতি সম্পর্কিত আইন। এ আইনের লক্ষ্য হচ্ছে শাসকের সাথে জনগণের সম্পর্ক, জনগণের অধিকার ও কর্তব্য এবং শাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা।

চ- আন্তর্জাতিক আইন: স্থিতিশীল ও যুদ্ধাবস্থায়ে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের কী ধরণের সম্পর্ক হবে, মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমের সাথে সম্পর্ক, জিহাদ, সন্ধি-চুক্তি ইত্যাদি সম্পর্ক সুবিন্যাস করা। এ আইনের লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার পরস্পর সম্পর্ক, সহযোগিতা ও সম্মানবোধ নির্ধারণ করা।

ছ- অর্থনীতি ও সম্পদ সম্পর্কিত আইন: এ আইনে মানুষের অর্থনৈতিক লেনদেন ও অধিকার, রাষ্ট্রের অধিকার ও এর সম্পদ নিয়ে করণীয়, রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও এর বণ্টন নীতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ আইনের

উদ্দেশ্য হলো ধনী, গরীব, রাষ্ট্র ও এর জনগণের মধ্যকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক সুসংগঠিত করা।

এ আইন রাষ্ট্রের সাধারণ ও বিশেষ সব ধরণের সম্পদ শামিল করে। যেমন, গনীমত, আনফাল, পণ্যকর, (যেমন কাস্টমস), খাজনা (ভূমির ট্যাক্স), কঠিন ও তরল খনিজ, প্রাকৃতিক সম্পদ। এছাড়াও এতে রয়েছে সমাজের সমষ্টিগত সম্পদ। যেমন, যাকাত, সাদাকাহ, মান্নত, ঋণ। আরও শামিল করে পারিবারিক সম্পদ। যেমন, পরিবারের ভরণ-পোষণ, উত্তরাধিকারী সম্পদ, অসিয়ত। আরও একত্রিত করে ব্যক্তিগত সম্পদ। যেমন, ব্যবসায়ের লাভ, ভাড়া, অংশীদারী কারবার, সব ধরণের প্রকল্প ও উৎপাদনের ব্যয়সমূহ। আরও আছে অর্থনৈতিক দণ্ড (জরিমানার অর্থ), যেমন, কাফফারা, দিয়াত ও ফিদিয়া ইত্যাদি।

জ- শিষ্টাচার ও রীতিনীতি: এ আইন মানুষের খামখেয়ালিপনা সীমিত করে, ভালো গুণাবলী বিকশিত করে, মানুষের মাঝে পরস্পর সহযোগিতা ও দয়ার্দ্রতা ইত্যাদিকে উৎসাহিত করে।

ফিকহ শাস্ত্র এতো প্রশস্ত ও বিস্তৃত হওয়ার কারণ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নায় প্রতিটি অধ্যায় সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৩- ইসলামী ফিকহের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো: এতে বৈধ অবৈধ নির্ধারণের বিষয়টি দীনী গুণে গুণান্বিত:

মানব রচিত অন্যান্য আইনের থেকে ইসলামী ফিকহের পার্থক্য হলো, এতে সব ধরণের কাজ-কর্ম, নাগরিকের লেনদেন ইত্যাদি সকল কাজেই হালাল হারামের নীতি বিদ্যমান যা লেনদেনকে দু'টি গুণে গুণান্বিত করে। সে দু'টি হচ্ছে:

প্রথমত: বাহ্যিক কাজ ও লেনদেনের ওপর ভিত্তি করে দুনিয়াবী হুকুম প্রদান, যা অপ্রকাশ্য বা গোপনীয় কিছুর সাথে সম্পর্কিত হয় না। আর তা হচ্ছে বিচার

ব্যবস্থার বিধান। কেননা বিচারক ব্যক্তির বাহ্যিক ও স্পষ্ট রূপ দেখেই ফয়সালা করে থাকেন।

আর এ প্রকারের হুকুম প্রদান করার মাধ্যমে বাস্তবে যা বাতিল সেটাকে হক করা হয় না, অনুরূপ বাস্তবে যা হক তাকে বাতিল করা হয় না, বাস্তবে যা হালাল তাকে হারাম করা হয় না, আবার বাস্তবে যা হারাম তাকে হালাল করাও হয় না। (অর্থাৎ বিচারের কারণেই যে হক বাতিল হবে বা বাতিল হক হয়ে যাবে, হালাল হারাম হয়ে যাবে বা হারাম কাজটি হালাল হয়ে যাবে তা কিন্তু নয়) তবে বিচারের ফয়সালা মান্য করা অত্যাবশ্যকীয়, যা ফতওয়ার বিধানের বিপরীত। কেননা ফতওয়ার হুকুম মান্য করা অত্যাবশ্যকীয় নয়।

দ্বিতীয়ত: জিনিসের প্রকৃত ও বাস্তবরূপের ওপর ভিত্তি করে আখিরাতের হুকুম দেওয়া, যদিও বিষয়টি অন্যের কাছে অস্পষ্ট। এটা হচ্ছে বান্দা ও আল্লাহর মাঝের ফয়সালা। এটি মহা-বিচারকের (আল্লাহর) হুকুম। এটি সাধারণত মুফতি তার ফতওয়ায় নির্ধারণ করেন।

৪- ইসলামী ফিকহের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো: এটি আখলাকের সাথে সম্পৃক্ত:

মানব রচিত অন্যান্য আইনের সাথে ইসলামী ফিকহের পার্থক্য হলো: এতে আখলাকী নিয়মরীতির প্রভাব বিদ্যমান। মানব রচিত আইনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা ঠিক রাখা ও সমাজে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। এ কাজ করতে যদিও দীনি বা আখলাকী কোনো মূলনীতির সাথে সংঘর্ষ বাধে তবুও তাতে কোনো পরওয়া করা হয় না।

অন্যদিকে ইসলামী ফিকহ সর্বদা সৎ গুণাবলী, সর্বোচ্চ মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠিত আখলাকী নিয়ম কানুনের প্রতি খেয়াল রাখে। এ কারণে মানবাত্মাকে পবিত্রকরণ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখতে ইবাদাত নীতির প্রণয়ন করা হয়েছে। রিবা তথা সুদ হারাম করা হয়েছে যাতে মানুষের মাঝে পরস্পর

সাহায্য-সহযোগিতা ও দয়া বিদ্যমান থাকে, সম্পদের মালিকের থেকে অভাবীবের সম্পদ হিফাযত করা যায়। লেনদেনে ধোকা ও নকল করতে নিষেধ করা হয়েছে, অন্যের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অজ্ঞতা ও অসন্তুষ্টি ইত্যাদি এ জাতীয় দোষ-ত্রুটির কারণে লেনদেনকে বাতিল করা হয়েছে। সকলের মাঝে ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা সম্প্রসারণ, মানুষের মাঝে ঝগড়া-ঝাটি বারণ, নোংরা থেকে মুক্ত থাকা ও অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাতে ইসলামী ফিকহ সর্বদা আদেশ দেয় ও উৎসাহিত করে।

লেনদেনের সাথে যখন উত্তম চরিত্র একত্র হয় তখন ব্যক্তি ও সমাজের সুখ-সৌভাগ্য বাস্তবায়িত হয় এবং এতে চিরস্থায়ী জান্নাতের পথ সুগম হয়। এভাবে ইসলামী ফিকহের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া ও আখিরাতে সত্যিকারের উত্তম মানুষ তৈরি করা ও উভয় জগতে সুখী করা। এ কারণেই ইসলামী ফিকহ সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য ও সবসময় বাস্তবায়নযোগ্য। ফিকহের কাওয়ায়েদ কুল্লিয়া (সর্বজনীন নীতিমালাসমূহ) কখনও পরিবর্তন হয় না। যেমন, বেচাকেনায় ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে সন্তুষ্ট থাকা, ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দেওয়া, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, অন্যের অধিকার সংরক্ষণ ও ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা ইত্যাদি গুণাবলী কখনও পরিবর্তন হয় না। অন্যদিকে কিয়াস, মাসালিহ মুরসালা (জনস্বার্থ), রীতি ও প্রথার ওপর ভিত্তি করে যে ফিকহ গঠিত তা যুগের চাহিদা, মানব কল্যাণের সুবিধা মোতাবেক, বিভিন্ন স্থান ও কালের পরিবেশ অনুযায়ী পরিবর্তন ও সংযোজন-বিয়োজন গ্রহণ করে, যতক্ষণ ফিকহের হুকুমটি শরী'আতের উদ্দেশ্য লক্ষ্যের খেয়াল রেখে ও এর সঠিক উসূলের ওপর ভিত্তি করে প্রদান করা হবে। এসব পরিবর্তন শুধু মু'আমালাত তথা লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আকীদা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আর এটিই নিম্নোক্ত কায়েদা দ্বারা উদ্দেশ্য:

تتغير الأحكام بتغير الأزمان.

“সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধানও পরিবর্তন হয়।”

তাহলে নির্ধারিত হয়ে গেলো যে, ফিকহের বিধান অনুযায়ী আমল করা অত্যাবশ্যকীয় ওয়াজিব।

হ্যাঁ, ফিকহের ওপর আমল করা ওয়াজিব। কেননা মুজতাহিদের কাছে যেটি তার ইজতিহাদ অনুযায়ী অগ্রাধিকার পাবে সে অনুযায়ী আমল করা তার ওপর ওয়াজিব। এটি তার জন্য আল্লাহরই হুকুম। আর মুজতাহিদ ছাড়া অন্যদের জন্য মুজতাহিদের ফাতওয়া অনুযায়ী আমল করতে হবে। কেননা উক্ত বিষয় সম্পর্কে শর‘ঈ বিধান জানতে মুজতাহিদকে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া তার সামনে আর কোনো পথ নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٧﴾ [الانبياء: ٧]

“সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর যদি তোমরা না জান। [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৭]

আর তাই শরী‘আতের যেসব বিধান অকাট্য দলিল দ্বারা সাব্যস্ত সেগুলো অস্বীকার করা বা কোনো হুকুমকে নির্দয় ও অমানবিক বলে মনে করা, যেমন, অপরাধের শাস্তির বিধান অথবা ইসলামী শরী‘আত সর্বযুগে প্রযোজ্য নয় এ দাবী করা কুফুরী হিসেবে গণ্য হবে এবং সে মুরতাদ হয়ে যাবে। অন্যদিকে যেসব বিধান প্রবল ধারণার ওপর ভিত্তি করে ইজতিহাদের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে সেগুলোকে অস্বীকার করলে সে গুনাহগার ও যালিম হবে। কেননা মুজতাহিদ সঠিকটি জানতে ও আল্লাহর হুকুম বর্ণনা করতে তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। এতে তিনি তার ব্যক্তিগত খামখেয়ালী অথবা ব্যক্তি স্বার্থ বা নামডাক ও সুনাম-সুখ্যাতি থেকে দূরে থেকেছেন। তিনি শর‘ঈ দলিলের ওপর নির্ভর করেছেন, হক ছিলো তার পথের অগ্রদূত, আমানতদারিতা, সততা ও ইখলাস ছিলো তার শ্লোগান।

লেখক

ড. সালিহ ইবন গানিম আস-সাদলান

প্রথম অধ্যায়: ইবাদাত

এতে রয়েছে:

১. ত্বহারাত

২. সালাত

৩. যাকাত

৪. সাওম

৫. হজ

৬. কুরবানী ও আকীকা

৭. জিহাদ।

প্রথম অধ্যায়: ইবাদাত

ইসলামের রুকনসমূহের প্রথম রুকন ত্বহারাত

ক- ত্বহারাতের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচয়:

ত্বহারাতের শাব্দিক অর্থ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অর্জন করা।

আর পরিভাষায় শরীরে বিদ্যমান যেসব অপবিত্রতার কারণে সালাত ও এ জাতীয় ইবাদাত পালন করা নিষিদ্ধ, তা দূর করাকে ত্বহারাত বলে।

পানি

খ- পানির প্রকারভেদ:

পানি তিন প্রকার।

প্রথম প্রকার পবিত্র পানি: আর তা হলো পানি তার সৃষ্টিগত স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যমান থাকা। আর তা হলো যে পানি দ্বারা অপবিত্রতা ও শরীরের পবিত্র অঙ্গের আপতিত নাজাসাত দূর করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ﴾ [الانفال: ١١]

“এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর যাতে এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করেন।” [সূরা আনফাল, আয়াত: ১১]

দ্বিতীয় প্রকার পবিত্র পানি: যে পানি নাজাসাত ছাড়াই রঙ বা স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তন হয়ে গেছে। এ ধরণের পানি নিজে পবিত্র; তবে এর যে কোনো একটি গুণাবলী পরিবর্তন হওয়ার কারণে এর দ্বারা অপবিত্রতা দূর করা যাবে না।

তৃতীয় প্রকার অপবিত্র পানি: যে পানি অল্প বা বেশি নাজাসাতের কারণে এর যে কোনো একটি গুণ পরিবর্তন হয়ে গেছে।

- অপবিত্র পানি পবিত্র হয়ে যাবে, তার পরিবর্তনের কারণ নিজে নিজে দূর হলে বা উক্ত পানি শুকিয়ে ফেললে অথবা এর সাথে এতটুকু পরিমাণ পানি মিশানো; যাতে পরিবর্তনের কারণ দূরীভূত হয়ে যায়।

❖ যখন কোনো মুসলিম পানির অপবিত্রতা বা পবিত্রতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে তখন সে তার নিশ্চিত ধারণার ওপর ভিত্তি করে পবিত্রতা অর্জন করবে। আর তা হলো, পবিত্র বস্তুসমূহের আসল হচ্ছে পবিত্র থাকা।

❖ যখন কোনো পানি, যা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায় আর যা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায় না এমন কোনো পানির সাথে সন্দেহে নিপতিত করবে তখন তা বাদ দিয়ে তায়াম্মুম করবে।

❖ যখন কোনো পবিত্র কাপড়, অপবিত্র বা হারাম কাপড়ে সাথে সন্দেহে নিপতিত করবে তখন ইয়াকীনের ওপর ভিত্তি করবে এবং সে কাপড় দ্বারা কেবল একটি সালাত আদায় করবে।

পবিত্রতার প্রকারভেদ:

শরী'আতে পবিত্রতা দু'প্রকার। অপ্রকাশ্য বা আত্মিক এবং প্রকাশ্য বা বাহ্যিক পবিত্রতা। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছোট বড় নাপাকী ও নাজাসাত থেকে পবিত্র করাকে বাহ্যিক পবিত্রতা বলে। আর পাপ-পঙ্কিলতা থেকে অন্তর পবিত্র করাকে অপ্রকাশ্য বা অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বলে।

প্রকাশ্য পবিত্রতাই ফিকহের বিষয়; যা সালাতে বাহ্যিকভাবে উদ্দেশ্য। এটি আবার দু'প্রকার: হাদাস (অদৃশ্যমান নাপাকী) থেকে পবিত্রতা ও খাবাস (দৃশ্যমান নাপাকী) থেকে পবিত্রতা। হাদাস থেকে পবিত্রতা তিনভাবে অর্জিত হয়: ১. বড় পবিত্রতা, তা গোসলের মাধ্যমে। ২. ছোট পবিত্রতা, তা অযুর মাধ্যমে। ৩. আর এ দু'টি ব্যবহার করতে অক্ষম তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করবে। অনুরূপভাবে খাবাস থেকে পবিত্রতাও তিনভাব অর্জিত হয়: গোসল, মাসেহ ও পানি ছিটানো।

পানির পাত্র সংক্রান্ত বিধি-বিধান

পানির পাত্রের পরিচয়:

ক. শাব্দিক পরিচিতি:

পানির পাত্রকে আরবীতে (الآنية) 'আনিয়া' বলা হয়। যে শব্দটি (إناء) 'ইনা' শব্দের বহুবচন। যার অর্থ আহার কিংবা পান-পাত্র। শব্দটির বহুবচনের বহুবচন হলো (أوان)। আরবী ভাষায় এর কাছাকাছি শব্দ হচ্ছে, (ظرف) 'যারফ' ও (ماعون) মা'উন।

ফকীহগণ শাব্দিক অর্থেই এটাকে ব্যবহার করেছেন।

খ- পাত্রের প্রকারভেদ:

সত্তাগত দিক থেকে পাত্র কয়েক প্রকার। যথাঃ

১- সোনা ও রূপার পাত্র।

২- রৌপ্যের প্রলেপযুক্ত পাত্র।

৩- কাঁচের পাত্র।

৪- মূল্যবান ধাতুর পাত্র।

৫- চামড়ার পাত্র।

৬- হাড়ের পাত্র।

৭- উপরে বর্ণিত পাত্র ব্যতীত অন্যান্য পাত্র। যেমন, চীনামাটির পাত্র, কাঠের পাত্র, পিতলের পাত্র ও সাধারণ পাত্র।

গ- পাত্রের শর'ঈ হুকুম:

সোনা, রূপা ও রৌপ্যের প্রলেপযুক্ত পাত্র ব্যতীত অন্যান্য সব পাত্র ব্যবহার করা বৈধ; চাই তা মূল্যবান হোক বা অল্প মূল্যের হোক। কেননা হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ».

“তোমরা সোনা ও রুপা পাত্রে পান করবে না। আর এসব পাত্রে খানা খাবে না। এগুলো দুনিয়াতে তাদের (অমুসলিমের) জন্য আর আমাদের জন্য রয়েছে আখিরাতে।”[1]

যে সব পাত্র ব্যবহার করা হারাম তা অন্যান্য উদ্দেশ্যে গ্রহণ করাও হারাম। যেমন, বাদ্যযন্ত্র গানের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা। নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সবাই সমান। কেননা হাদীসটি সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে এটা জানা আবশ্যক যে, সন্দেহের কারণে কোনো পাত্র অপবিত্র হবে না; যতক্ষণ নিশ্চিতভাবে অপবিত্র হওয়া জানা না যাবে। কেননা মূল হলো পবিত্র হওয়া।

ঘ- অমুসলিমের পাত্র:

অমুসলিমদের পাত্র বলতে বুঝানো হচ্ছে:

১- আহলে কিতাবীদের পাত্র।

২- মুশরিকদের পাত্র।

এসব পাত্রের শর‘ঈ হুকুম হলো এগুলো অপবিত্র হওয়া নিশ্চিত না হলে তা ব্যবহার করা জায়েয। কেননা মূল হলো পবিত্র হওয়া।

- অমুসলিমের জামা কাপড় পবিত্র, যতক্ষণ তা অপবিত্র হওয়া নিশ্চিত না হয়।
- যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া বৈধ সেসব মারা গেলে সেসবের মৃত চামড়া দাবাগাত (প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার উপযোগী) করলে তা পবিত্র বলে গণ্য হবে।

[1] সহীহ বুখারী, আল-আত‘ঈমা, হাদীস নং ৫১১০; সহীহ মুসলিম, লিবাস ওয়ায-যিনা, হাদীস নং ২০৬৭; তিরমিযী, আশরিবা, হাদীস নং ১৮৭৮; নাসাঈ, আয-যিনা, হাদীস নং ৫৩০১; আবু দাউদ, আল-আশরিবা, হাদীস নং ৩৭২৩; ইবন মাজাহ, আশরিবা, হাদীস নং ৩৪১৪; আহমদ, ৫/৩৯৭; আদ-দারেমী, আল-আশরিবা, হাদীস নং ২১৩০।

- আর যেসব প্রাণীর জীবিত অবস্থায় কোনো অংশ বিচ্ছেদ করা হয়েছে তা মৃত-প্রাণীর মতোই অপবিত্র। তবে জীবিত অবস্থায় পশম, পালক, চুল ও লোম নেওয়া হলে তা পবিত্র।
- খাবার ও পানীয় পাত্র ঢেকে রাখা সুন্নত। জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, «وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا».

“তোমার পানি রাখার পাত্রের মুখ বন্ধ রাখো এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো। তোমার বাসনপত্র ঢেকে রাখো এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো। সামান্য কিছু দিয়ে হলেও তার উপর দিয়ে রেখে দাও।”[1]

---

[1] সহীহ বুখারী, বাদউল খালক, হাদীস নং ৩১০৬; সহীহ মুসলিম, আল-আশরিবা, হাদীস নং ২০১২; তিরমিযী, আল-আত‘ঈমা, হাদীস নং ১৮১২; আবু দাউদ, আল-আশরিবা, হাদীস নং ৩৭৩১; আহমদ, ৩/৩০৬; মালেক, আল-জামে‘, হাদীস নং ১৭২৭।

ইস্তিঞ্জা ও পেশাব পায়খানার আদবসমূহ

□ **ইস্তিঞ্জা:** ইস্তিঞ্জা হলো পেশাব ও পায়খানার রাস্তা থেকে নির্গত অপবিত্রতা পানি দ্বারা দূর করা।

□ **ইস্তিজমার:** আর ইস্তিজমার হলো পেশাব ও পায়খানার রাস্তা থেকে নির্গত অপবিত্রতা পাথর বা কাগজ বা অনুরূপ জিনিস দ্বারা দূর করা।

□ পেশাব পায়খানায় প্রবেশের সময় বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং এ দো'আ পড়া,

« بسم الله، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ»

"বিসমিল্লাহ, আমি মন্দকাজ ও শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি"।[1]

□ আর বের হওয়ার সময় ডান পা আগে দিয়ে বের হওয়া এবং এ দো'আ পড়া,

«غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي»

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমার থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং স্বস্তি দান করেছেন"।[2]

□ পেশাব-পায়খানার সময় বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে বসা মুস্তাহাব, তবে খালি জায়গায় পেশাব-পায়খানা করলে মানুষের দৃষ্টির বাহিরে নির্জন স্থানে বসা। পেশাব করার সময় নরম স্থান নির্বাচন করা, যাতে পেশাবের ছিটা থেকে পবিত্র থাকা যায়।

---

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৭৫।

[2] হাদীসের প্রথম অংশটুকু আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং ৩০। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আর দ্বিতীয় অংশটুকু ইবন মাজাহ বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং ৩০১। আলবানী রহ. হাদীসটিকে দ'য়ীফ বলেছেন।

- অতি প্রয়োজন ছাড়া এমন কোনো কিছু সাথে নেওয়া মাকরূহ যাতে আল্লাহর নাম রয়েছে। তাছাড়া জমিনের কাছাকাছি না হওয়ার আগে কাপড় তোলা, কথা বলা, গর্তে পেশাব করা, ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা এবং ডান হাত দিয়ে ঢিলা ব্যবহার করা মাকরূহ।
- উন্মুক্ত স্থানে পেশাব-পায়খানার সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ ফিরিয়ে বসা হারাম, আর ঘরের মধ্যে বসা জায়েয, তবে না বসা উত্তম।
- চলাচলের রাস্তা, বসা ও বিশ্রামের জায়গায়, ফলদার ছায়াদার গাছ ইত্যাদির নিচে পেশাব-পায়খানা করা হারাম।
- পবিত্র পাথর দিয়ে তিনবার শৌচকর্ম করা মুস্তাহাব। এতে ভালোভাবে পবিত্র না হলে সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা যাবে। তবে বেজোড় সংখ্যা তিন বা পাঁচ বা ততোধিক বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার করা দ্বারা কাজটি শেষ করা সুন্নাত।
- হাড়, গোবর, খাদ্য ও সম্মানিত জিনিস দ্বারা ঢিলা করা হারাম। পানি, টিস্যু ও পাতা ইত্যাদি দিয়ে ঢিলা করা জায়েয। তবে শুধু পানি ব্যবহার করার চেয়ে পাথর ও পানি একত্রে ব্যবহার করা উত্তম।
- কাপড়ে অপবিত্রতা লাগলে তা পানি দিয়ে ধৌত করা ফরয। আর যদি অপবিত্র স্থান অজ্ঞাত থাকে তবে পুরো কাপড় পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে।
- বসে পেশাব করা সুন্নাত, তবে পেশাবের ছিটা থেকে নিরাপদ থাকলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ নয়।

স্বভাবজাত সুন্নাতসমূহ

ক- পরিচিতি: সরল পথ, সৃষ্টিগত স্বভাব। যেসব গুণাবলী মানুষের জীবনে থাকা অত্যাবশ্যকীয় সেগুলোকে স্বভাবজাত সুন্নাত বলে।

খ- স্বভাবজাত সুন্নাতসমূহ:

১- মিসওয়াক করা: এটা সব সময় করা সুন্নাত। মুখের পবিত্রতা ও রবের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মিসওয়াক করা হয়। অযু, সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, মসজিদে ও গৃহে প্রবেশ, ঘুম থেকে জাগ্রত হলে ও মুখের গন্ধ পরিবর্তন হলে মিসওয়াক করার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

২- নাভির নিচের লোম কামানো, বগলের লোম উপড়ানো, নখ কাটা ও আঙ্গুলের গিরা ধৌত করা।

৩- মোচ কাটা, দাড়ি লম্বা করা ও ছেড়ে দেওয়া।

৪- মাথার চুলের সম্মান করা, এতে তেল দেওয়া এবং আঁচড়ানো। চুলে গোছা রাখা অথাৎ মাথার এক অংশ কামানো আর বাকী অংশ না কামানো মাকরূহে তাহরীমী; কেননা এতে স্বাভাবিক সৃষ্টিগত সৌন্দর্য নষ্ট হয়।

৫- মেহেদী বা অনুরূপ উদ্ভিদ দিয়ে চুলের সাদা অংশ পরিবর্তন করা।

৬- মিসক বা অন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৭- খৎনা করা। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের ঢেকে থাকা চামড়া কর্তন করা যাতে এতে ময়লা ও পেশাব জমে থাকতে না পারে।

আর মহিলাদের ক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গের উপরিভাগে পুংলিঙ্গ প্রবেশদ্বারের চামড়ার কিছু অংশ কেটে ফেলা, এটা বিচির মতো বা মোরগের চূড়ার (বৌল) মতো। খৎনা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ এটি জানেন। খৎনা মূলত পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য করা হয়। এতে অনেক ফযীলত রয়েছে। পুরুষের জন্য খৎনা করা সুন্নাত আর নারীর জন্য এটা করা সম্মানজনক।

অযু

ক- অযুর পরিচিতি:

শরী‘আতের নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী পবিত্র পানি চার অঙ্গে ব্যবহার করা।

খ- অযুর ফযীলত:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস অযুর ফযীলত প্রমাণ করে। তিনি বলেছেন,

«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».

“তোমাদের যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে অযু করে এ দো‘আ পাঠ করবে, ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল’ তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।”[1]

অযুতে অপচয় না করে উত্তমরূপে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করলে কিয়ামতের দিন অযুকারীর হাত-পা ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থাকা আবশ্যক করবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ»

[1] সহীহ মুসলিম, ত্বহারাত, হাদীস নং ২৩৪; তিরমিযী, ত্বহারাত, হাদীস নং ৫৫; নাসাঈ, ত্বহারাত, হাদীস নং ১৪৮; ইবন মাজাহ, তাহারাত ও এর সুন্নাতসমূহ, হাদীস নং ৪৭০; মুসনাদ আহমদ, ৪/১৫৩।

“কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে, অযুর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল থাকবে উজ্জ্বল। তাই তোমাদের মধ্যে যে এ উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারে, সে যেন তা করে।”[1]

গ- অযুর শর্তাবলী:

অযুর শর্তাবলী দশটি। সেগুলো হলো:

১- ইসলাম।

২- জ্ঞান বা বিবেক।

৩- ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী তথা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

৪- নিয়ত করা এবং পবিত্রতা অর্জন শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিয়ত অবশিষ্ট থাকা।

৫- যেসব কারণে অযু ফরয হয় সেসব কারণ দূর হওয়া।

৬- ইস্তিঞ্জা করা (পেশাব ও পায়খানার রাস্তা থেকে নির্গত অপবিত্রতা পানি দ্বারা দূর করা) ও ইস্তিজমার করা (পেশাব ও পায়খানার রাস্তা থেকে নির্গত অপবিত্রতা পাথর বা পাতা বা অনুরূপ জিনিস দ্বারা দুর করা)।

৭- পানি পবিত্র হওয়া।

৮- পানি বৈধ হওয়া।

৯- চামড়ায় পানি পৌঁছতে বাধা থাকলে তা দূর করা।

১০- যে ব্যক্তির সর্বদা অপবিত্র হওয়ার সমস্যা থাকে তার ক্ষেত্রে ফরয সালাতের ওয়াক্ত হওয়া।

ঘ- অযু ফরয হওয়ার কারণ:

হাদাস বা সাধারণ অপবিত্রতা পাওয়া গেলে অযু ফরয হয়।

ঙ- অযুর ফরযসমূহ:

অযুর ফরয ছয়টি:

---

[1] সহীহ বুখারী, অযু, হাদীস নং ১৩৬; সহীহ মুসলিম, ত্বহারাত, হাদীস নং ২৪৬; ইবন মাজাহ, যুহুদ, হাদীস নং ৪৩০৬; মুসনাদ আহমদ, ২/৪০০; মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং ৬০।

১- মুখমণ্ডল ধৌত করা আর মুখ ও নাক মুখমণ্ডলেরই অংশ।

২- কনুইসহ দুহাত ধৌত করা।

৩- মাথা মাসেহ করা আর দু'কানও মাথারই অংশ।

৪- দু'পা ধৌত করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ ۝٦﴾ [المائدة: ٦]

"হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর)।" [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৬]

৫- ধৌত অঙ্গের মধ্যে পরস্পর ক্রমবিন্যাস বজায় রাখা। কেননা আল্লাহ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন এবং দু অঙ্গ ধোয়ার মধ্যে একটি মাসেহ করার বিষয় উল্লেখ করেছেন। (যা ক্রমবিন্যাস আবশ্যক হওয়া বুঝায়)।

৬- অযু করার সময় এক অঙ্গ ধৌত করার সাথে সাথেই বিলম্ব না করে অন্য অঙ্গ ধৌত করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে করেছেন।

চ- অযুর সুন্নতসমূহ:

অযুর সুন্নতসমূহের অন্যতম হলো:

১- মিসওয়াক করা।

২- হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা।

৩- কুলি ও নাকে পানি দেওয়া।

৪- ঘন দাড়ি ও হাত-পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা।

৫- ডান দিক থেকে শুরু করা।

৬- দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ধৌত করা।

৭- কান ধোয়ার জন্য নতুন পানি গ্রহণ করা।

৮- অযুর পরে দো‘আ পড়া।

৯- অযুর পরে দু’রাকাত সালাত আদায় করা।

ছ- অযুর মাকরূহসমূহ:

অযুর মাকরূহসমূহের অন্যতম হলো:

১- অপবিত্রতা ছিটে অযুকারীর দিকে আসতে পারে এমন অপবিত্র স্থানে অযু করা।

২- অযুতে তিনবারের অধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন তিনবার ধৌত করেছেন। তিনি বলেছেন, «مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ».

“অতঃপর যে ব্যক্তি এর অধিক করে সে অবশ্যই জুলুম ও অন্যায় করে।”[1]

৩- পানি ব্যবহারে অপচয় করা। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ পানি দিয়ে অযু করেছেন। আর মুদ হলো এক মুঠো। তাছাড়া যেকোনো কিছুতে অপচয় করা নিষেধ।

৪- অযুতে এক বা একাধিক সুন্নত ছেড়ে দেওয়া; কেননা সুন্নত ছেড়ে দিলে সাওয়াব কমে যায়। তাই সুন্নতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিৎ, ছেড়ে দেওয়া অনুচিত।

জ- অযু ভঙ্গের কারণসমূহ:

অযু ভঙ্গের কারণ সাতটি, সেগুলো হলো:

১- পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া।

২- শরীরের অন্য কোনো অঙ্গ থেকে কোনো কিছু বের হওয়া।

৩- পাগল, বেহুশ বা মাতাল ইত্যাদি কারণে জ্ঞানশূণ্য হওয়া।

৪- পুরুষ বা নারী কর্তৃক তাদের লজ্জাস্থান পর্দা ব্যতীত সরাসরি স্পর্শ করা।

---

[1] সুনান নাসাঈ, ত্বহারাত, হাদীস নং ১৪০; আবু দাউদ, ত্বহারাত, হাদীস নং ১৩৫।

৫- পুরুষ নারীকে বা নারী পুরুষকে কামভাবের সাথে স্পর্শ করা।

৬- উটের গোশত খাওয়া।

৭- যেসব কারণে গোসল ফরয হয় সেসব কারণে অযুও ফরয হয়, যেমন ইসলাম গ্রহণ ও বীর্য বের হওয়া, তবে মারা গেলে শুধু গোসল ফরয হয়, অযু ফরয হয় না।

গোসল

ক- গোসলের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচিতি:

দম্মা যোগে (الغُسل) গুসল অর্থ পানি, ফাতহা যোগে (الغَسل) গাসল অর্থ গোসল করা আর কাসরা যোগে (الغِسل) গেসল অর্থ পরিস্কার করার উপাদান। শরী‘আতের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মাথার অগ্রভাগ থেকে পায়ের নিচ পর্যন্ত সারা শরীরে পবিত্র পানি প্রবাহিত করা। এতে নারী ও পুরুষ সবাই সমান, তবে হায়েয ও নিফাসের গোসলের সময় রক্তের চিহ্ন পরোপুরিভাবে দূর করতে হবে যাতে রক্তের দুর্গন্ধ দূর হয়।

খ- গোসল ফরয হওয়ার কারণসমূহ:

গোসল ফরয হওয়ার কারণ ছয়টি:

১- নারী বা পুরুষের কামভাবের সাথে সজোরে বীর্য বের হওয়া।

২- পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর যৌনাঙ্গের ভিতর প্রবেশ করলে।

৩- আল্লাহর রাস্তায় শহীদ ব্যতীত অন্যসব মুসলিম মারা গেলে গোসল ফরয।

৪- প্রকৃত কাফির বা মুরতাদ ইসলাম গ্রহণ করলে।

৫- হায়েয হলে।

৬- নিফাস হলে।

গ- ইসলামে মুস্তাহাব গোসলসমূহ:

১- জুমু‘আর দিনের গোসল।

২- ইহরামের গোসল।

৩- মাইয়্যেতকে গোসলকারী ব্যক্তির গোসল।

৪- দুই ‘ঈদের গোসল।

৫- কারো পাগল বা বেহুশ অবস্থা কেটে গেলে।

৬- মক্কায় প্রবেশের গোসল।

৭- সূর্যগ্রহণ ও বৃষ্টি প্রার্থনার সালাতের জন্য গোসল।

৮- মুস্তাহাযা তথা প্রদররোগগ্রস্তা নারীর প্রতি ওয়াক্ত সালাতের জন্য গোসল।

৯- সব ধরণের ভালো সম্মেলনের জন্য গোসল।

ঘ- গোসলের শর্তাবলী:

গোসলের শর্তাবলী সাতটি:

১- যে কারণে গোসল ফরয হয় তা শেষ হওয়া।

২- নিয়ত করা।

৩- ইসলাম।

৪- আকল বা বুদ্ধি-বিবেক।

৫- ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী তথা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

৬- পবিত্র ও বৈধ পানি।

৭- চামড়ায় পানি পৌঁছতে বাধা থাকলে তা দূর করা।

ঙ -গোসলের ওয়াজিবসমূহ:

গোসলের ওয়াজিব হলো বিসমিল্লাহ বলা, ভুলে গেলে এ ওয়াজিব রহিত হয়ে যায়, ইচ্ছাকৃত বাদ দিলে ওয়াজিব ছুটে যাবে।

চ -গোসলের ফরযসমুহ:

নিয়ত করা, সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা, মুখ ও নাকে পানি প্রবেশ করানো। পানি পৌঁছল কিনা এ ব্যাপারে প্রবল ধারণা হলেই যথেষ্ট হবে। কেউ সুন্নাত বা ফরয গোসলের নিয়ত করলে এক নিয়ত অন্য নিয়াতের জন্য যথেষ্ট হবে।

জানাবাত ও হায়েযের গোসল একই নিয়াতে যথেষ্ট হবে।

ছ- গোসলের সুন্নাতসমুহ:

১- বিসমিল্লাহ বলা।

২- গোসলের শুরুতে শরীরে বিদ্যমান অপবিত্রতা বা ময়লা দূর করা।

৩- পাত্র হাত ঢুকানোর পূর্বে দুহাতের কব্জি পর্যন্ত ধোয়া।

৪- গোসলের শুরুতে অযু করা।

৫- ডান দিক থেকে শুরু করা।

৬- ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

৭- সারা শরীরে হাত মর্দন করা।

৮- গোসল শেষে দুপা অন্য স্থানে সরে ধৌত করা।

জ- গোসলের মাকরূহসমূহ:

গোসলে নিম্নোক্ত কাজ করা মাকরূহ:

১- পানির অপব্যয় করা।

২- অপবিত্র স্থানে গোসল করা।

৩- দেয়াল বা পর্দা ছাড়া খোলা জায়গায় গোসল করা।

৪- স্থির পানিতে গোসল করা।

ঝ- জুনুবী বা বড় অপবিত্র ব্যক্তির জন্য যেসব কাজ করা হারাম:

১- সালাত আদায় করা।

২- বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা।

৩- গিলাফ ব্যতীত কুরআন স্পর্শ করা ও বহন করা।

৪- মসজিদে বসা।

৫- কুরআন পড়া।

=======

নাজাসাত তথা নাপাকীর বিধিবিধান ও তা দূর করার পদ্ধতি

ক- নাজাসাত (নাপাকী) এর শাব্দিক ও শর‘ঈ অর্থ:

নাজাসাতের শাব্দিক অর্থ ময়লা, যেমন বলা হয় نجس الشيء نجسا বস্তুটি ময়লা হয়েছে। আবার বলা হয়, تنجس الشيء: صار نجسا: تلطخ بالقذر অর্থাৎ ময়লা মাখিয়ে দেওয়া।

শরী‘আতের পরিভাষায় ‘নাজাসাত’ হলো, নির্দিষ্ট পরিমাণ ময়লা যা সালাত ও এ জাতীয় ইবাদাত করতে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন, পেশাব, রক্ত ও মদ।

খ- নাজাসাতের ধরণ:

নাজাসাত দু’ধরণের:

১- সত্তাগত বা প্রকৃত নাজাসাত।

২- হুকমী তথা বিধানগত নাজাসাত।

সত্তাগত বা প্রকৃত নাজাসাত হলো কুকুর ও শূকর ইত্যাদি। এসব নাজাসাত ধৌত করা বা অন্য কোনো উপায়ে কখনো পবিত্র হয় না।

আর হুকমী তথা বিধানগত নাজাসাত হলো ঐ নাপাকী যা পবিত্র স্থানে পতিত হয়েছে।

গ- নাজাসাতের প্রকারভেদ:

নাজাসাত তিন প্রকার। যথা:

১- এক ধরনের নাপাকী (নাজাসাত) রয়েছে যা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত।

২- আরেক ধরনের নাপাকী (নাজাসাত) রয়েছে যা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন।

৩- আরেক ধরনের নাপাকী (নাজাসাত) রয়েছে যা অপবিত্র হওয়ার পরও ক্ষমার পর্যায়ে। অর্থাৎ কোনো ক্ষতি হয় না।

যার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ:

১- যেসব নাজাসাত অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত, সেগুলো হলো:

ক- সব স্থলচর মৃতপ্রাণী। জলচর মৃতপ্রাণী পবিত্র এবং খাওয়া হালাল।

খ- প্রবাহিত রক্ত, যা স্থলচর প্রাণী জবেহ করার সময় প্রবাহিত হয়।

৩- শূকরের মাংস।

৪- মানুষের পেশাব।

৫- মানুষের পায়খানা।

৬- মযী বা কামরস[1]।

৭- অদী[2]।

৮- যেসব প্রাণী খাওয়া হালাল নয় তার গোশত।

৯- জীবিত প্রাণীর কর্তিত অংশ। যেমন, জীবিত ছাগলের বাহু কেটে ফেললে।

১০- হায়েযের রক্ত।

১১- নিফাসের রক্ত।

১২- ইস্তেহাযা বা প্রদরগ্রস্ত নারীর রক্ত।

২- যেসব জিনিস অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন তা হলো:

১- যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সেসব প্রাণীর প্রশাব।

২- যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সেসব প্রাণীর গোবর।

৩- বীর্য।

৪- কুকুরের লালা।

৫- বমি।

---

[1] মযী হলো, স্বচ্ছ, পাতলা, পিচ্ছিল পানি, যা যৌন উত্তেজনার শুরুতে বের হয় কিন্তু চরম পুলক অনুভব হয় না, তীব্র বেগে বের হয় না ও বের হওয়ার পর কোনো ক্লান্তি আসে না। অনেক সময় এ পানি বের হওয়ার বিষয়টি অনুভব করা যায় না। -অনুবাদক।

[2] পেশাবের আগে পরে নির্গত রস। -অনুবাদক।

৬- রক্তহীন মৃতপ্রাণী, যেমন মৌমাছি, তেলাপোকা, পাখাবিহীন ক্ষুদ্র কীট ইত্যাদি।

৩- যেসব নাজাসাত অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে মার্জনা করা হয়েছে, অর্থাৎ দোষমুক্ত। সেগুলো হলো:

১- রাস্তার মাটি।

২- সামান্য রক্ত।

৩- মানুষ বা গোশত খাওয়া যায় এমন হালাল প্রাণীর বমি ও পুঁজ।

নাজাসাত পবিত্র করার পদ্ধতি:

গোসল, পানি ছিটিয়ে দেওয়া, ঘর্ষণ ও মুছে ফেলার মাধ্যমে নাজাসাত পবিত্র করা যায়।

- অপবিত্র কাপড় পবিত্রকরণ: যদি নাজাসাত আকার ও আয়তন বিশিষ্ট দৃশ্যমান বস্তু হয় তবে প্রথমে তা ঘষে তুলে ফেলতে হবে অতঃপর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। আর যদি নাজাসাত ভেজা হয় তবে তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।
- শিশুর পেশাব পবিত্রকরণ: যেসব শিশু আলাদা খাদ্য খায় না সেসব শিশুর পেশাব পানি ছিটিয়ে দিলে পবিত্র হয়ে যায়।
- জমিনে লেগে থাকা নাজাসাত আকার আয়তন বিশিষ্ট দৃশ্যমান নাজাসাত দূর করার মাধ্যমে পবিত্র করা হবে। আর যদি জমিনের সাথে থাকা নাজাসাত তরল বস্তু হয় তবে তাতে পানি ঢেলে পবিত্র করতে হবে। আর জুতা মাটিতে ঘর্ষণ বা পবিত্র জায়গায় হাটলে পবিত্র হয়ে যায়। মসৃণ জিনিস যেমন, কাঁচ, চাকু, প্রস্তরফলক ইত্যাদি মুছে ফেললে পবিত্র হয়ে যায়। কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করতে হবে, তবে একটিবার মাটি দিয়ে ধৌত করতে হবে।

তায়াম্মুম

১- তায়াম্মুমের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচিতি:

ক- তায়াম্মুমের শাব্দিক অর্থ: ইচ্ছা করা, কামনা করা, মনস্থ করা।

খ- তায়াম্মুমের পারিভাষিক অর্থ: পবিত্র মাটি দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মুখ ও দু হাত মাসাহ করা।

আল্লাহ এ উম্মতের জন্য যেসব বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দান করেছেন তায়াম্মুম সেসব বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। এটি পানির পরিবর্তে পবিত্র হওয়ার মাধ্যম।

২- কার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ:

ক- পানি পাওয়া না গেলে বা পানি দূরে থাকলে।

খ- কারো শরীরে ক্ষত থাকলে বা অসুস্থ হলে এবং সে পানি ব্যবহার করলে ক্ষত বা অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে।

গ- পানি অতি ঠাণ্ডা হলে এবং গরম করতে সক্ষম না হলে।

ঘ- যদি মজুদ পানি ব্যবহারের কারণে নিজে বা অন্য কেউ পিপাসায় নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা করে।

৩- তায়াম্মুম ফরয হওয়ার শর্তাবলী:

ক- বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

খ- মাটি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া।

গ- অপবিত্রতা নষ্টকারী কোনো কিছু ঘটা।

৪- তায়াম্মুম শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী:

ক- ইসলাম।

খ- হায়েয বা নিফাসের রক্ত শেষ হওয়া।

গ- আকল বা বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া।

ঘ- পবিত্র মাটি পাওয়া।

৫- তায়াম্মুমের ফরযসমূহ:

ক- নিয়ত।

খ- পবিত্র মাটি।

গ- একবার মাটিতে হাত মারা।

ঘ- মুখমণ্ডল ও হাতের তালু মাসাহ করা।

৬- তায়াম্মুমের সুন্নাতসমূহ:

ক- বিসমিল্লাহ বলা।

খ- কিবলামুখী হওয়া।

গ- সালাতের আদায়ের ইচ্ছা করার আগে করা

ঘ- দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মারা।

ঙ- ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

চ- এক অঙ্গের সাথে বিরতিহীন অন্য অঙ্গ মাসাহ করা।

ছ- আঙ্গুল খিলাল করা।

৭- তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহ:

ক- পানি পাওয়া গেলে।

খ- উল্লিখিত অযু ও গোসল ভঙ্গের কারণসমূহ পাওয়া গেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা তায়াম্মুম হলো অযু ও গোসলের স্থলাভিষিক্ত, আর মূল পাওয়া গেলে তার স্থলাভিষিক্তের কাজ শেষ হয়ে যায়।

৮- তায়াম্মুমের পদ্ধতি:

প্রথমে তায়াম্মুমের নিয়ত করবে, অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে দুহাত মাটিতে মারবে, অতঃপর এর দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি ধারাবাহিক ও বিরতিহীনভাবে মাসাহ করবে।

৯- ব্যান্ডেজ ও ক্ষতস্থানে তায়াম্মুম:

কারো হাড় ভেঙ্গে গেলে বা শরীরে ক্ষত বা জখম হলে পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা করলে ও কষ্ট হলে তবে ব্যান্ডেজ ও ক্ষতস্থানে তায়াম্মুম করবে এবং বাকী অংশ ধুয়ে ফেলবে।

কেউ পানি ও মাটি কোনটিই না পেলে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই সালাত আদায় করে নিবে। তাকে উক্ত সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না।

মোজা ও বন্ধ ফলকের উপর মাসাহ:

১- ইবন মুবারক বলেছেন, মোজার উপর মাসাহর ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। ইমাম আহমাদ বলেছেন, মোজার উপর মাসাহর ব্যাপারে আমার অন্তরে কোনো সংশয় নেই। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে চল্লিশটি হাদীস বর্ণিত আছে। পা ধোয়ার চেয়ে মোজার উপর মাসাহ করা উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ উত্তমটিই তালাশ করতেন।

২- সময়সীমা:

মুকিমের জন্য একদিন ও একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিনদিন ও তিনরাত মাসাহ করা জায়েয। মোজা পরিধান করার পরে প্রথম বার অপবিত্র হওয়া থেকে সময়সীমা শুরু হয়।

৩- মোজার উপর মাসাহর শর্তাবলী:

পরিধেয় মোজা বৈধ ও পবিত্র হওয়া। ফরয পরিমাণ অংশ ঢেকে থাকা এবং মোজা পবিত্র অবস্থায় পরিধান করা।

৪- মোজার উপর মাসাহর পদ্ধতি:

পানিতে হাত ভিজিয়ে পায়ের উপরিভাগের আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে নলা পর্যন্ত একবার মাসাহ করা। পায়ের নিচে ও পিছনে মাসাহ নয়।

৫- মোজার উপর মাসাহ ভঙ্গের কারণসমূহ:

নিচের চারটির যে কোনো একটি কারণে মোজার উপর মাসাহ নষ্ট হয়ে যায়:

১- পায়ের থেকে মোজা খুলে ফেললে।

২- মোজা খুলে ফেলা অত্যাবশ্যকীয় হলে, যেমন গোসল ফরয হলে।

৩- পরিহিত মোজা বড় ছিদ্র বা ছিড়ে গেলে।

৪- মাসাহের মেয়াদ পূর্ণ হলে।

সব ধরণের পট্টি বা ব্যান্ডেজ খুলে না ফেলা পর্যন্ত তার উপর মাসাহ করা জায়েয, এতে মেয়াদ যতই দীর্ঘ হোক বা জানাবত তথা বড় নাপাকী লাগুক।

=====

সালাত

- সালাত সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ
- জামা‘আতে সালাত আদায়।
- কসরের সালাত।
- ’সালাত একত্র আদায়।
- সাহু সাজদাহ।
- নফল সালাত।
- জুমু‘আর সালাত।
- দুই ঈদের সালাত।
- সালাতুল ইসতিস্কা বা বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত।
- সালাতুল কুসূফ বা সূর্যগ্রহণের সালাত।
- জানাযার সালাত ও এর বিধিবিধান।

ইসলামের দ্বিতীয় রুকন সালাত

১- সালাতের শাব্দিক ও শর‘ঈ পরিচিতি:

সালাতের শাব্দিক অর্থ দো‘আ। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ﴾ [التوبة: ١٠٣]

“আর তাদের জন্য দো‘আ করুন, নিশ্চয় আপনার দো‘আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর।”[1]

শর‘ঈ পরিভাষায় সালাত হলো, সুনির্দিষ্ট শর্তাবলীতে নির্দিষ্ট কিছু কথা ও কাজ, যা তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয় এবং সালাম ফিরানোর দ্বারা শেষ হয়।

২- সালাত কখন ফরয হয়?

হিজরতের পূর্বে ইসরা তথা মি‘রাজের রাতে সালাত ফরয হয়। ইসলামে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাক্ষ্য প্রদানের পরের রুকন হলো সালাত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদের পরে সালাতের শর্ত দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ في سبيل الله »

“সব কিছুর মাথা হলো ইসলাম, বুনিয়াদ হলো সালাত আর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ”।[2]

৩- শরী‘আতে সালাত বিধিবদ্ধ হওয়ার হিকমত:

আল্লাহ তাঁর বান্দাহর ওপর অসংখ্য যেসব নি‘আমত দান করেছেন সালাত হলো সেসব নি‘আমতের শুকরিয়া। এছাড়া সালাত আল্লাহর দাসত্বের উৎকৃষ্ট নমুনা। যেহেতু সালাতে বান্দা আল্লাহর প্রতি মনোযোগ দেয়, নতশির হয়,

---

[1] সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৩।

[2] তিরমিযী, ঈমান, হাদীস নং ২৬১৬। ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবন মাজাহ, আল-ফিতান, হাদীস নং ৩৯৭৩; মুসনাদ আহমদ, ৫/২৩১।

একনিষ্ঠ হয়ে তারই কাছে তিলাওয়াত, যিকর ও দো‘আর মাধ্যমে মুনাজাত করে। এমনিভাবে এতে রয়েছে এমন সম্পর্ক যা বান্দা ও তার রবের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করে এবং পার্থিব জগতের উর্ধ্বে উঠে পরিচ্ছন্ন অন্তর ও প্রশান্তির জগতে নিয়ে যায়। মানুষ যখনই পার্থিব জীবনের মোহে ডুবে যায় তখন সালাত সেসব মায়া মুক্ত করে এবং তাকে বাস্তবতার সামনে দাঁড় করায় যার সম্পর্কে সে উদাসীন। সালাত তাকে স্মরণ করে দেয় যে, সে বাস্তবতা অনেক বড়। এ জীবন এত দৃঢ়ভাবে সৃষ্টি ও মানুষের জন্য সব কিছু অধিন্যস্ত করে দেওয়া শুধু জীবন যাপনের জন্য নয়; বরং এ জীবন থেকে অন্য জীবনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি।

৪- সালাতের হুকুম ও এর সংখ্যা:

সালাত দু’ধরণের: ফরয ও নফল সালাত। ফরয সালাত আবার দু’প্রকার: ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া। ফরযে আইন সালাত প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়ষ্ক মুসলিম নর-নারীর পর ফরয। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরযে আইন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾ [النساء : ١٠٣]

“নিশ্চয় সালাত মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩]

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥﴾ [البينة: ٥]

“আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ‘ইবাদত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়; আর এটিই হলো সঠিক দীন।” [সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৫]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ».

“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর। আল্লাহ ব্যতীত কোনো (সত্য) ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, এ কথার সাক্ষ্য দান, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া”।[1]

নাফে‘ ইবন আযরাক ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কুরআনে পেয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পেয়েছি। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন,

﴿فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمۡسُونَ وَحِينَ تُصۡبِحُونَ ١٧ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَعَشِيّٗا وَحِينَ تُظۡهِرُونَ ١٨﴾ [الروم: ١٧، ١٨]

“অতএব, তোমরা আল্লাহর তাসবীহ কর, যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে এবং সকালে উঠবে। আর অপরাহ্নে ও জোহরের সময়ে। আর আসমান ও যমীনে সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। [সূরা আর-রূম, আয়াত: ১৭-১৮]

«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» . فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»

“নজদবাসী এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তার কথার মৃদু আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু সে কী বলছিল, আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না। এভাবে সে কাছে এসে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। সে বলল, আমার ওপর এ ছাড়া আরও সালাত আছে?’ তিনি বললেন, না; তবে নফল আদায় করতে পার।”[2]

---

[1] সহীহ বুখারী, ঈমান, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসলিম, ঈমান, হাদীস নং ১৬; তিরমিযী, ঈমান, হাদীস নং ২৬০৯; নাসাঈ, ঈমান ও এর শারায়ে‘, হাদীস নং ৫০০১; আহমদ, ২/৯৩।

[2] সহীহ বুখারী, সাওম, হাদীস নং ১৭৯২; সহীহ মুসলিম, ঈমান, হাদীস নং ১১; নাসাঈ, সিয়াম,

৫- বাচ্চাদের সালাতের নির্দেশ:

বাচ্চাদের সাত বছর বয়স হলে সালাতের আদেশ দিতে হবে। দশ বছর হলে সালাত আদায় না করলে মৃদু প্রহার করতে হবে। কেননা হাদীসে এসেছে,

«مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ».

"তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তাদেরকে সালাত পড়ার নির্দেশ দাও, যখন তাদের বয়স দশ বছর হবে তখন সালাত না পড়লে এ জন্য তাদের শাস্তি দাও এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও"।[1]

৬- সালাত অস্বীকারকারীর হুকুম:

কেউ জেনেশুনে সালাত ফরয হওয়া অস্বীকার করলে সে কাফির, যদিও সে সালাত আদায় করে। কেননা সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও উম্মতের ইজমায় মিথ্যারোপ করল। এমনিভাবে যে ব্যক্তি অবজ্ঞা, অলসতা ও অবহেলা করে সালাত ত্যাগ করে, যদিও সে সালাত ফরয হওয়া স্বীকার করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ﴾ [التوبة: ٥]

"তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫]

হাদীস নং ২০৩০; আবু দাউদ, সালাত, হাদীস নং ৩৯১; আহমদ, ১/১৬২; মালিক, আন-নিদা লিসসালাত, হাদীস নং ৪২৫; দারেমী, সালাত, হাদীস নং ১৫৭৮।

[1] আবু দাউদ, সালাত, হাদীস নং ৪৯৪; আহমদ, ২/১৮৭। আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ».

"বান্দা এবং শির্ক-কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত পরিত্যাগ করা"।[1]

৭- সালাতের রুকনসমূহ:

সালাতে চৌদ্দটি রুকন বা ফরয রয়েছে। এগুলো ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে হোক বা অজ্ঞতাবশত হোক কোনোভাবেই বাদ দেওয়া যাবে না। এগুলো নিম্নরূপ:

১- দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ের সামর্থ থাকলে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা।

২- আল্লাহু আকবর বলে সালাতে প্রবেশ করা। এ তাকবীর ব্যতীত অন্য কিছু বললে সালাত হবে না।

৩- সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করা।

৪- রুকু করা।

৫- রুকু থেকে সোজা হয়ে উঠা।

৬- সাজদাহ করা।

৭- সাজদাহ থেকে উঠে বসা।

৮- দু'সাজদাহর মাঝে বসা।

৯- ধীর স্থিরভাবে কাজ করা।

১০- শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া।

১১- শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের জন্য বসা।

১২- তাশাহহুদের পরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করা।

---

[1] সহীহ মুসলিম, ঈমান, হাদীস নং ৮২; তিরমিযী, ঈমান, হাদীস নং ২৬২০; আবু দাউদ, ইস-সুন্নাহ, হাদীস নং ৪৬৭৮; ইবন মাজাহ, ইকামতুস সালাহ ওয়াসসুন্নাতু ফিহা, হাদীস নং ১০৭৮; আহমদ, ৩/৩৭০; দারেমী, সালাত, হাদীস নং ১২৩৩।

১৩- সালাম ফিরানো। আর তা হলো السلام عليكم ورحمة الله বলা। وبركاته শব্দ বৃদ্ধি না করা উত্তম। কেননা ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে বলেছেন,

السلام عليكم ورحمة الله

আবার বাম দিকেও সালাম ফিরিয়ে বলতেন,

السلام عليكم ورحمة الله

১৪- রুকনসমূহের মাঝে তারতীব তথা ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

সালাতের ওয়াজিবসমূহ:

সালাতে আটটি ওয়াজিব রয়েছে। ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে, তবে ভুল ও অজ্ঞতাবশতঃ ছুটে গেলে এ ওয়াজিব রহিত হয়ে যাবে। এগুলো হলো,

১- তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া প্রত্যেক উঠা, নামা, বসা, ও দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলা।

২- ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারী রুকু থেকে উঠার সময় «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলা।

৩- রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ‘রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ’ পড়া।

৪- রুকুতে কমপক্ষে একবার «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ‘সুবহানা রাব্বিয়াল ‘আযীম’ বলা।

৫- সাজদাহয় «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» ‘সুবাহানা রাব্বিয়াল ‘আ‘লা’ কমপক্ষে একবার পড়া।

৬- দু’সাজদাহর মাঝে দো‘আ পড়া

«رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي»

“রাব্বিগ ফিরলী, রাব্বিগ ফিরলী” (হে আমার রব! আমায় ক্ষমা করুন, হে আমার রব! আমায় ক্ষমা করুন)।[1]

৭- প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া।

৮- প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসা।

৯- সালাতের শর্তাবলী:

শর্তের শাব্দিক অর্থ নিদর্শন।

পরিভাষায়: শর্তকৃত বিষয়টি উক্ত শর্ত ছাড়া পাওয়া যাবে না, তবে শর্তটি পাওয়া গেলেই মাশরূত তথা শর্তকৃত জিনিসটি পাওয়া যাওয়া অত্যাবশ্যকীয় নয়।

সালাতের শর্তাবলী হলো: নিয়ত, ইসলাম, আকল বা জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া, ভালো-মন্দ পার্থক্য করার মতো বয়স হওয়া, সালাতের ওয়াক্ত হওয়া, পবিত্র হওয়া, কিবলামুখী হওয়া, সতর ঢাকা ও নাজাসাত থেকে মুক্ত হওয়া।

১০- পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সীমা:

ওয়াক্ত শব্দটি التوقيت তাওকীত থেকে নেওয়া হয়েছে, এর অর্থ নির্ধারিত। ওয়াক্ত হলো সালাত ফরয হওয়ার কারণ ও সালাত শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদীসে সালাতের ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ البَيْتِ مَرَّتَيْنِ».

“জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম কা‘বার চত্বরে দু’বার আমার সালাতের ইমামতি করেছেন।”[2] অতঃপর তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সীমা উল্লেখ করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[1] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৮৯৭। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[2] তিরমিযী, সালাত, হাদীস নং ১৪৯; আবু দাউদ, সালাত, হাদীস নং ৩৯৩; আহমদ, ১/৩৩৩।

«ثُمَّ التَفتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ».

"অতঃপর জিবরীল ('আলাইহিস সালাম) আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই হলো আপনার পূর্ববর্তী নবীদের (সালাতের) ওয়াক্ত। সালাতের ওয়াক্ত এ দুই সীমার মাঝখানে।"[1]

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সীমা দিন রাতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কেননা মানুষ যখন রাতে ঘুমাবে তার বিশ্রাম শেষ হবে, প্রভাত ঘনিয়ে আসবে, পরিশ্রম ও কাজের সময় হবে তখন ফজরের সালাতের ওয়াক্ত হয়, তখন মানুষ অন্যান্য মাখলুক থেকে নিজেকে আলাদা হিসেবে ভাবতে থাকে, সালাতের মাধ্যমে সে দিনকে স্বাগত জানায় এবং এতে তার ঈমান বৃদ্ধি পায়।

আবার দিনের মধ্যভাগে যোহর সালাতে তার রবের সামনে দাড়িয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করে এবং তার দিনের কাজগুলো বিশুদ্ধ করে নেয়। অতঃপর আসে আসরের সময়। তখন দিনের বাকী অংশকে অভ্যর্থনা জানাতে আসরের সালাত আদায় করে। অতঃপর রাতকে অভ্যর্থনা জানাতে মাগরিবের সালাত ও ইশার সালাত, আর এ দু'টি তার মধ্যে বহন করে রহস্যের আধার, নূর ও হিদায়েতের পথের ভাণ্ডার। এছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সালাত আদায় আল্লাহর সৃষ্টি ও সম্রাজ্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ও রাত দিনে মানুষের সমস্ত কাজ সঠিকভাবে পরিচালনা করার বিরাট সুযোগ।

যোহর সালাতের ওয়াক্ত:

সূর্য ঢলে পড়লে যোহর সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়। অর্থাৎ আকাশের মাঝামাঝি থেকে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে যোহর সালাতের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং

[1] তিরমিযী, সালাত, হাদীস নং ১৪৯; আবু দাউদ, সালাত, হাদীস নং ৩৯৩; আহমদ, ১/৩৩৩।

যোহর সালাতের ওয়াক্ত শেষ সময় হলো প্রতিটি জিনিসের ঢলে পড়া মূল ছায়া বাদে উক্ত জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হলে।[1]

আসর সালাতের ওয়াক্ত:

প্রতিটি জিনিসের ঢলে পড়া ছায়া বাদে উক্ত জিনিসের ছায়া তার সমপরিমাণ হলে আসরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। অর্থাৎ যোহরের সময় শেষ হলে আসরের সময় শুরু হয়। আর নির্ভরযোগ্য মতে আসরের শেষ সময় হলো, ঢলে পড়ার পরে প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ পরিমাণ হলে। বিশেষ প্রয়োজনে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় বাকী থাকে।

মাগরিব সালাতের ওয়াক্ত:

সূর্যাস্তের সাথে সাথেই মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং মাগরিবের শেষ ওয়াক্ত হলো আকাশে যখন তারকা স্পষ্ট হয়। আর মাকরূহসহ মাগরিবের শেষ সময় হলো, পশ্চিমাকাশে লালিমা যখন দূরীভূত হয়।

ইশা সালাতের ওয়াক্ত:

পশ্চিমাকাশে লালিমা দূরীভূত হলে ইশার ওয়াক্ত শুরু হয়। আর ইশার শেষ সময় হলো মধ্যরাত।

ফজর সালাতের ওয়াক্ত:

পূর্বাকাশে ফজরে সানী (সুবহে সাদিক তথা শুভ্র আভা) উদিত হলে ফজরের সালাতের সময় শুরু হয়। আর ফজরের শেষ সময় হলো সূর্যোদয়।

১১- উচ্চ অক্ষরেখার দেশসমূহে সালাতের সময় নির্ধারণ:

উচ্চ অক্ষরেখার দেশসমূহকে তিনভাগে ভাগ করা যায়:

---

[1] এটা চিনার উপায় হলো, সূর্য যখন ঢলে পড়ে তখন তার ছায়ার অতিরিক্ত অংশের দিকে তাকাবে, ছায়া যখন ব্যক্তির সমপরিমাণ হবে তখন যোহর সালাতের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে।

১- যেসব দেশ ৪৫ ও ৪৮ ডিগ্রী উত্তর-দক্ষিণ অক্ষাংশ রেখায় অবস্থিত সেসব দেশে রাত-দিন যতই দীর্ঘ বা ছোট হোক দিন-রাতের সময়ের বিভাজনকারী ভৌগলিক রেখা স্পষ্ট বুঝা যায়।

২- আর যেসব দেশ ৪৮ ও ৬৬ ডিগ্রী উত্তর-দক্ষিণ অক্ষাংশ রেখায় অবস্থিত সেসব দেশে বছরের কিছুদিন দিন-রাতের সময়ের বিভাজনকারী ভৌগলিক রেখা বুঝা যায় না। যেমন লালিমা দূরীভূত হতে না হতেই ফজরের সময় এসে যায়।

৩- অন্যদিকে যেসব দেশ ৬৬ ডিগ্রীরও বেশি উত্তর-দক্ষিণ অক্ষাংশ রেখায় অবস্থিত সেসব দেশে বছরের দীর্ঘ সময় ধরে দিন-রাতের সময়ের বিভাজনকারী ভৌগলিক রেখা স্পষ্ট বুঝা যায় না।

প্রত্যেক প্রকারের হুকুম:

প্রথম প্রকারের অঞ্চলের লোকেরা পূর্বোল্লিখিত সময় অনুযায়ী সালাত আদায় করবে।

আর তৃতীয় প্রকারের অঞ্চলের বাসীন্দারা সালাতের সময় নির্ধারণ করে নিবে। এতে কোনো মতানৈক্য নেই। দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীস থেকে এ ধরণের স্থানে সালাতের সময় নির্ধারণ করে নিতে বলা হয়েছে। এ হাদীসে এসেছে,

«قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ، أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ».

“সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, দাজ্জাল পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করবে? তিনি বললেন, চল্লিশ দিন। প্রথম দিনটি হবে এক বছরের সমান। দ্বিতীয় দিনটি হবে এক মাসের সমান। তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের সমান। আর বাকী দিনগুলো হবে তোমাদের এদিনগুলোর মতো। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে

দিনটি এক বছরের সমান হবে তাতে একদিনের সালাত পড়া কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, না। এদিনটিকে সাধারণ দিনের সমান অনুমান করে নিও।”[1]

সেসব স্থানের সময় কীভাবে নির্ধারিত করতে হবে সে ব্যাপারে আলেমগণ কয়েকটি মত ব্যক্ত করেছেন। কতিপয় আলেমের অভিমত হলো: ঐ স্থানে নিকটতম দেশে যেখানে দিন-রাত পার্থক্য করা যায় এবং শরী‘আত নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সালাতের সময় নির্ধারণ করা যায় সে স্থানের সময় অনুযায়ী সালাতের সময় নির্ধারণ করতে হবে। এ উক্তিটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, স্বাভাবিক সময় হিসেবে সালাতের সময় নির্ধারণ করতে হবে। বার ঘন্টা দিন ধরতে হবে। তেমনিভাবে বার ঘন্টা রাত ধরতে হবে। কেউ কেউ আবার মক্কা বা মদীনার সময় অনুযায়ী সালাতের সময় নির্ধারণ করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রকারের অঞ্চলে ইশা ও ফজরের সময় ব্যতীত অন্যান্য ওয়াক্তের সময় প্রথম প্রকারের সময় অনুযায়ী হবে। আর ফজর ও ইশা তৃতীয় প্রকার অঞ্চলের মতো নির্ধারণ করে নিতে হবে।

---

[1] সহীহ মুসলিম, ফিতান ওয়াআশরাতস সা‘আ, হাদীস নং ২৯৩৭; তিরমিযী, ফিতান, হাদীস নং ২২৪০; আবু দাউদ, আল-মালাহিম, হাদীস নং ৪৩২১; ইবন মাজাহ, ফিতান, হাদীস নং ৪০৭৬; আহমদ, ৪/১৮২।

জামা'আতে সালাত আদায়

ক- জামা'আতে সালাত আদায়ের হিকমত:

জামা'আতে সালাত আদায় করা আল্লাহর অনেক বড় অনুগত্য ও একটি শ্রেষ্ঠতম ইবাদত। তাছাড়া এটি মুসলিমের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়ার্দ্রতা ও সমতার অন্যতম নিদর্শন। যেহেতু মুসলিমগণ দিনে রাতে পাঁচবার একটি মহান উদ্দেশ্যে একজন নেতার অধীনে একই দিকে ফিরে মসজিদে ছোটখাটো একটি সম্মেলনে সমবেত হয়। ফলে তাদের অন্তর একত্রিত ও পরিচ্ছন্ন হয়, পরস্পর দয়া ও সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় এবং মতানৈক্য দূরীভূত হয়।

খ- জামা'আতে সালাত আদায়ের হুকুম:

নিজ এলাকায় অবস্থানরত হোক বা সফররত প্রত্যেক স্বাধীন, সক্ষম পুরুষের ওপর জামা'আতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ﴾ [النساء : ١٠٢]

“আর যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকবে। অতঃপর তাদের জন্য সালাত কায়েম করবে, তখন যেন তাদের মধ্য থেকে একদল তোমার সাথে দাঁড়ায়।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০২]

এখানে আল্লাহর আদেশটি ওয়াজিব তথা অত্যাবশ্যকীয় অর্থে। কঠিন ভয়ের সময় যেহেতু জামা'আতে সালাত কায়েম আদেশ দিয়েছেন, সেহেতু নিরাপদ ও ভয়বিহীন সময় জামা'আতে সালাত আদায় করা যে আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় তা ভালোভাবেই বুঝা যায়।

গ- সর্বনিম্ন কতজন দ্বারা জামা'আত সংঘটিত হয়:

ইমামের সাথে একজন পুরুষ বা নারী যে কোনো একজন হলেই জামা'আত সংঘটিত হয়। আবু মুসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ»

“দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি জামা‘আত হতে পারে।”[1]

ঘ -জামা‘আতে সালাত আদায়ের স্থান:

মসজিদে জামা‘আত করা সুন্নাত, তবে প্রয়োজন হলে মসজিদ ছাড়া অন্য জায়গাও জামা‘আত করা জায়েয। মহিলারা পুরুষ ছাড়াও নিজেরা জামা‘আত করতে পারবে। ইমাম দারা কুতনী রহ. বর্ণনা করেছেন, আয়েশা ও উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা এভাবে জামা‘আত করেছেন।

«وَأَمَرَ أم ورقة أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا».

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে ওয়ারাকা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে তার গৃহে মহিলাদের সালাতের ইমামতি করার নির্দেশ দেন।”[2]

সালাতুল কসর বা সফরের সালাত

ক- কসরের সালাতের অর্থ:

সফরে সালাত কসর করার অর্থ হলো চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতকে দুই রাকাত আদায় করা। মুসলিমের বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনা করে ইসলামী শরী‘আত তাদের জন্য যেসব সহজতা করেছে এটা তারই অন্যতম বিধান। কুরআন, সুন্নাহ ও সমস্ত ইমামদের ঐক্যমতে কসরের সালাত শরী‘আতসিদ্ধ ও জায়েয।

খ- নিরাপত্তা ও ভয় উভয় অবস্থাতেই কসর করা যাবে:

সফরে নিরাপদ অবস্থায় হোক বা ভীত অবস্থায় উভয় অবস্থায়ই কসর করা যাবে। আয়াতে যে ভয়ের কথা বলা হয়েছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রের দিক বিবেচনা করে বলা হয়েছে। (কারণ হিসেবে নয়) কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রায় সফরই ভয়মুক্ত ছিল না। একবার ‘আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বললেন, আমরা নিরাপদ হওয়া

---

[1] ইবন মাজাহ, ইকামাতুস সালাহ ওয়াসসুন্নাতু ফিহা, হাদীস নং ৯৭২।

[2] আবু দাউদ, সালাত, হাদীস নং ৫৯১; আহমদ, ৬/৪০৫।

সত্ত্বেও আপনি আমাদের সালাত কসর করলেন। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাকে বললেন, আপনি যে বিষয়ে আশ্চর্য হয়েছেন আমিও সে বিষয়ে আশ্চর্য হয়েছিলাম। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন,

«صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»

“এটি আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি একটি সদকা। তোমরা তাঁর সদকাটি গ্রহণ করো।”[1]

গ- সালাতের কসর করার জন্য সফরের দূরত্ব:

প্রচলিত অর্থে যেটুকু দূরত্বকে সফর বলা হয় এবং এর জন্য পথের পাথেয় ও সামগ্রী বহন করা হয় সেটুকু দূরত্বের সফর করলেই সালাত কসর করে আদায় করা যাবে।

ঘ- কখন থেকে কসর শুরু করবে:

মুসাফির যখন তার বসবাসরত এলাকা ছেড়ে বিচ্ছিন্ন হবে, যাকে প্রচলিত অর্থে বিচ্ছিন্ন বলা হয় তখন থেকেই কসর শুরু করবে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা জমিনে ভ্রমন করার সময় কসর করতে বলেছেন। আর নিজ এলাকার সীমা অতিক্রম না করলে জমিনে ভ্রমনকারী বলা হয় না।

দু’ওয়াক্ত সালাত একত্রে আদায়

প্রয়োজনের সময় দু’ওয়াক্ত সালাত একত্রে পড়ার অনুমতি রয়েছে। স্পষ্ট প্রয়োজন ব্যতীত দু ওয়াক্ত সালাত একত্রে আদায় না করা অনেক ‘আলেম

[1] সহীহ মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ওয়াকাসরিহা, হাদীস নং ৬৮৬; তিরমিযী, তাফসীরুল কুরআন, হাদীস নং ৩০৩৪; নাসাঈ, তাকসীরুস সালাহ ফিস সাফরী, হাদীস নং ১৪৩৩; আবু দাউদ, সালাত, হাদীস নং ১১৯৯; ইবন মাজাহ, ইকামাতুস সালাহ ওয়াসসুন্নাতু ফিহা, হাদীস নং ১০৬৫; আহমদ, ১/৩৬; দারেমী, সালাত, হাদীস নং ১৫০৫।

মুস্তাহাব বলেছেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব অল্প সংখ্যকবার ব্যতীত দু'ওয়াক্ত সালাত একত্রে আদায় করেন নি। যাদের জন্য কসর করা জায়েয তাদের জন্য দু'ওয়াক্ত সালাত একত্রে আদায়ও জায়েয, তবে যাদের জন্য দু'ওয়াক্ত সালাত একত্রে আদায় জায়েয তাদের সবার জন্য কসর করা জায়েয নয়।

পরের ওয়াক্ত সালাত আগের ওয়াক্তের সাথে পড়া এবং আগের সালাত পরের ওয়াক্তের সাথে পড়া। ব্যক্তির জন্য আগে ও পরে যেভাবে পড়লে অধিক সহজ হয় সেভাবে পড়া উত্তম। কেননা কসরের উদ্দেশ্য হলো সহজতা ও হালকা করা। আর আগে বা পরে আদায়ে উভয় ক্ষেত্রে যদি সমান হয় তাহলে পরের ওয়াক্তের সাথে একত্রে পড়া উত্তম। মুসাফির যখন কোথাও অবস্থান করার জন্য অবতরণ করবে তখন প্রত্যেক ওয়াক্ত সালাত নির্ধারিত সময় আদায় করা সুন্নাত।

সাহু সাজদাহ

সালাতে السهو। শব্দের অর্থ ভুলে যাওয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বীয় কাজ ও আদেশের কারণে সব আলিমের ঐকমত্যে সাহু সাজদাহ শরী'আতসম্মত। সালাতে ভুলে বেশি বা কম করলে বা সন্দেহ হলে সাহু সাজদাহ দেওয়া শরী'আতসম্মত। সালামের আগে বা পরে সাহু সাজদাহ দিতে হয়। তাশাহহুদ ছাড়া তাকবীর বলে পরপর দু'টি সাজদাহ দিতে হয়, এরপরে সালাম ফিরাবে।

নফল সালাত

ক- নফল সালাত শরী'আতসম্মত হওয়ার হিকমত:

বান্দার ওপর আল্লাহর অশেষ নি'আমত হচ্ছে তিনি মানুষের স্বভাব উপযোগী নানা ধরণের ইবাদতের ব্যবস্থা করেছেন। এর দ্বারা তিনি সঠিকভাবে বান্দার থেকে আরোপিত কাজ বাস্তবায়ন করেন। যেহেতু মানুষ ভুল-ত্রুটি করে। তাই আল্লাহ এসব ভুলের ক্ষতিপূরণে বিকল্প আমলের ব্যবস্থা করেছেন। আর তা হলো নফল সালাত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, নফল সালাত ফরয সালাতের পরিপূরক। মুসল্লি যদি ফরয সালাত পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে না পারে তবে নফল সালাত তার পরিপূরক হয়।

খ- সর্বোত্তম নফল ইবাদত:

সর্বোত্তম নফল ইবাদত হলো আল্লাহর পথে জিহাদ। অতঃপর দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ ١١﴾ [المجادلة: ١١]

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন।

অতঃপর নফল সালাত। এটি সর্বোত্তম শারীরিক ইবাদাত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اسْتَقِيمُوا، وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ»

“তোমরা (দীনের ওপর) অবিচল থাকো, আর তোমরা কখনও তা যথাযথভাবে পালন করতে পারবে না। জেনে রাখো, তোমাদের আমালসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সালাত।”[1]

নফল সালাতের মধ্যে অন্যতম হলো:

ক- সালাতুল লাইল তথা তাহাজ্জুদের সালাত:

[1] ইবন মাজাহ, ত্বাহারাত ওয়াসুনানিহা, হাদীস নং ২৭৭; আহমদ, ৫/২৮২; দারেমী, ত্বাহারাত, হাদীস নং ৬৫৫।

সালাতুল লাইল তথা রাতের সালাত দিনের সালাতের চেয়ে উত্তম, আবার রাতের শেষার্ধের সালাত প্রথমার্ধের চেয়ে উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ».[1]

"যখন রাতের অর্ধেক অতিবাহিত হয় তখন আমাদের সুমহান রব প্রতি রাতে পৃথিবীর আসমানে অবতরণ করেন।" [2][মুসলিম]

তাহাজ্জুদ হলো ঘুমের পরে যে সালাত পড়া হয়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেছেন, রাতের বেলায় ঘুম থেকে জেগে উঠে সালাত আদায় করা হলো নাশিয়াতুল লাইল তথা তাহাজ্জুদ সালাত।

খ- সালাতুদ-দোহা:

মাঝে মাঝে সালাতুদ্দোহা আদায় করা সুন্নাত। আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لاَ يَدَعُ، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لاَ يُصَلِّي.

---

[1] হাদীসের মূল নসটি এভাবে, [অনুবাদক] «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ». "আমাদের রব প্রতি রাতের যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন পৃথিবীর আসমানে অবতরণ করেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৫৮) অথবা নসটি এভাবে হবে, [অনুবাদক] «إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ، أَوْ ثُلُثَاهُ، يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا».

[2] সহীহ বুখারী, জুমু'আ, হাদীস নং ১০৯৪; সহীহ মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ওয়াকাসরিহা, হাদীস নং ৭৫৮; তিরমিযী, সালাত, হাদীস নং ৪৪৬; আবু দাউদ, সালাত, হাদীস নং ১৩১৫; ইবন মাজাহ, ইকামাতুস সালাহ ওয়াসসুন্নাতু ফিহা, হাদীস নং ১৩৬৬; মুসনাদ আহমদ, ২/২৬৭; মালিক, নিদা লিসসালাহ, হাদীস নং ৪৯৬; সুনান দারেমী, সালাত, হাদীস নং ১৪৭৮।

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে সালাতুদ-দোহা আদায় করতেন যে, আমরা বলতাম তিনি হয়ত আর পরিত্যাগ করবেন না। আবার যখন তা আদায় করা থেকে বিরত থাকতেন তখন আমরা বলতাম যে, হয়ত তিনি আর তা আদায় করবেন না”।[1]

সালাতুদ-দোহার সর্বনিম্ন সংখ্যা দুরাক‘আত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার ও ছয় রাকাত আদায় করেছেন। আর সালাতুদ-দোহার সর্বোচ্চ সংখ্যা আট রাকাত। এ সালাত সর্বদা আদায় করা শর্ত নয়।

গ- তাহিয়্যাতুল মাসজিদ:

মসজিদে প্রবেশ করে তাহিয়্যাতুল মাসজিদের সালাত আদায় করা সুন্নাত। আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»

“তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দু’ রাকাত সালাত না পড়া পর্যন্ত না বসে।”[2] (বহু হাদীস প্রণেতারা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

ঘ- তিলাওয়াতের সাজদাহ:

কুরআন তিলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের জন্য তিলাওয়াতের সাজদাহ দেওয়া সুন্নাত। তাকবীর বলে সাজদাহ দিবে এবং সাজদাহ থেকে উঠে সালাম ফিরাবে। সাজদায় সুবহানা রাব্বিআল ‘আলা বা সাজদায় যেসব দো‘আ পড়া হাদীসে এসেছে সেগুলো পড়া।

---

[1] তিরমিযী, সালাত, হাদীস নং ৪৭৭; আহমদ, ৩/৩৬।

[2] সহীহ বুখারী, জুমু‘আ, হাদীস নং ১১১৪; সহীহ মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ওয়াকাসরিহা, হাদীস নং ৭১৪; তিরমিযী, সালাত, হাদীস নং ৩১৬; নাসাঈ, আল-মাসাজিদ, হাদীস নং ৭৩০; আবু দাউদ, সালাত, হাদীস নং ৪৬৭; ইবন মাজাহ, ইকামাতুস সালাহ ওয়াসসুন্নাতু ফিহা, হাদীস নং ১০১৩; আহমদ, ৫/৩১১; দারেমী, সালাত, হাদীস নং ১৩৯৩।

ঙ- শুকরিয়ার সাজদাহ:

কোন নি'আমত প্রাপ্ত হলে বা বিপদাপদ কেটে গেলে শুকরিয়ার সাজদাহ দেওয়া সুন্নাত। কেননা আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

«كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ، خَرَّ سَاجِدًا»

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোনো খুশির খবর আসলে তিনি আল্লাহর সমীপে সাজদায় লুটিয়ে পড়তেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু খাওয়ারেজদের মধ্যে 'যুসসুদাইয়্যা' পেয়ে শুকরিয়ার সাজদাহ করেছেন। (মুসনাদ আহমাদ)

তাছাড়া কা'ব ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর তাওবা কবুলের সুসংবাদ তার কাছে পৌঁছলে তিনি সাজদাহ করেন। তার এ ঘটনা সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। এ সাজদার নিয়ম ও বিধান তিলাওয়াতের সাজদার মতোই।

চ- তারাবীহর সালাত:

তারাবীহর সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সুন্নাত চালু করেছেন। রমযান মাসে ইশার সালাতের পরে মসজিদে জামা'আতের সাথে এ সালাত আদায় করতে হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সালাতের জামা'আত চালু করেছেন। উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর খিলাফাত কালে এ সুন্নাত পুনর্জীবিত করেছেন। উত্তম হলো এগারো রাকাত পড়া, তবে এর চেয়ে বেশি পড়লেও কোনো অসুবিধে নেই। রমযানের শেষ দশকে কিয়ামুল লাইল, যিকির ও দো'আ বেশি পরিমাণে করার চেষ্টা করা।

ছ- বিতরের সালাত:

বিতরের সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সালাত পড়েছেন এবং তা আদায় করতে আদেশ করেছেন। বিতরের সালাত

সর্বনিম্ন এক রাকাত। তিন রাকাত হলো পরিপূর্ণভাবে আদায় এবং সর্বোচ্চ এগারো রাকাত।

বিতরের সালাতের সময়:

ইশা ও ফজর সালাতের মধ্যবর্তী সময়। রুকু থেকে উঠে দো'আ কুনূত পড়া মুস্তাহাব।

বিতরের সালাতের নিয়ম:

১- একসাথে সব রাকাত পড়বে, তাশাহহুদের জন্য বসবে না, শুধু শেষ রাকাতে তাশাহহুদ পড়বে।

২- যত রাকাত পড়বে তার শেষ রাকাতের আগের রাকাতে বসে তাশাহহুদ পড়বে, অতঃপর সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়াবে, অতঃপর এক রাকাত পড়বে, তারপরে তাশাহহুদ ও সালাম ফিরাবে।

৩- প্রত্যেক দুই রাকাতে সালাম ফিরাবে, অতঃপর এক রাকাত পড়বে ও এতে তাশাহহুদ ও সালাম ফিরাবে। এ পদ্ধতিটি সর্বোত্তম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পদ্ধতিতে বিতরের সালাত আদায় করেছেন এবং সর্বদা এভাবেই আদায় করেছেন।

জ- সুন্নাতে রাতেবা বা ফরয সালাতের আগে পিছের নফলসমূহ:

সুন্নাতে রাতেবা বা ফরযের আগে পরের সালাতের মধ্যে সর্বোত্তমটি হচ্ছে, **ফজরের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নাত**। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে মারফু‘ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে,

«رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

“ফজরের দু’রাকাত সুন্নাত দুনিয়া এবং তদস্থিত সমুদয় বস্তু থেকেও উত্তম।”[1] (ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

[1] সহীহ মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন ওয়াকাসরিহা, হাদীস নং ৭২৫; তিরমিযী, সালাত, হাদীস নং ৪১৬; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল ওয়াতাতাও‘উন নাহারি, হাদীস নং ১৭৫৯; আহমদ,

সুন্নাতে রাতেবা মুয়াক্কাদাহ বা ফরযের আগে পরে মোট বারো রাকাত তাকীদ দেওয়া সুন্নাত রয়েছে, সেগুলো হলো, যোহরের আগে চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পরে দুই রাকাত, ইশার পরে দুই রাকাত ও ফজরের আগে দুই রাকাত।

কারো সুন্নাতে রাতেবা বা ফরযের আগে পরের সুন্নাত ছুটে গেলে কাযা করা সুন্নাত। আর বিতরের কাযা জোড় সংখ্যায় করতে হবে, তবে একাধিক ফরয কাযা হলে তখন কষ্টকর হওয়ার কারণে বিতর কাযা করতে হবে না, তবে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত কাযা করবে, যেহেতু এ ব্যাপারে তাগিদ এসেছে। ফরয ও জামা'আতে পড়া যায় এমন সালাত ব্যতীত সব নফল সালাত ঘরে পড়া উত্তম।

৬/২৬৫।

জুমু‘আর সালাত

ক- জুমু‘আর সালাতের ফযীলত:

জুমু‘আর দিন সপ্তাহের সর্বোত্তম ও সম্মানিত দিন। আল্লাহ তা‘আলা এ দিনটিকে এ উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন এবং এতে তাদের জন্য জমায়েত হওয়া শরী‘আতসম্মত করেছেন। এ সমাবেশের হিকমত হলো মুসলিমের মধ্যে পরস্পর পরিচিতি, ভালোবাসা, দয়াশীলতা ও সাহায্য-সহযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়া। জুমু‘আর দিন মুসলিমের সাপ্তাহিক ঈদের দিন এবং সূর্য উদিত দিনের মধ্যে সর্বোত্তম দিন।

খ- জুমু‘আর সালাতের হুকুম:

জুমু‘আর সালাত ফরয। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ۝٩﴾ [الجمعة: ٩]

“হে মুমিনগণ, যখন জুমু‘আর দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচা-কেনা বর্জন কর”। [সূরা আল-জুমু‘আ, আয়াত: ৯]

জুমু‘আর সালাত দুই রাকাত। এ সালাতের জন্য গোসল করা ও তাড়াতাড়ি মসজিদে যাওয়া সুন্নাত।

গ- কার ওপর জুমু‘আর সালাত ফরয :

প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন ও শর‘ঈ ওযর ব্যতীত সক্ষম ব্যক্তির ওপর জুমু‘আর সালাত ফরয।

ঘ- জুমু‘আর সালাতের ওয়াক্ত:

সূর্য ঢলে পড়ার আগে জুমু‘আর সালাত পড়া সহীহ হবে, তবে সূর্য ঢলে পড়ার পরে পড়া উত্তম। কেননা সূর্য ঢলে পড়ার পরেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় জুমু‘আর সালাত আদায় করেছেন।

ঙ- কতজনের সমন্বয় জুমু‘আর জামা‘আত সংঘটিত হয়:

‘উরফ তথা প্রথাগতভাবে যতজন লোক হলে জামা‘আত হয় ততজন লোক হলেই জুমু‘আর সালাতের জামা‘আত সংঘটিত হয়।

চ- জুমু‘আর সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী:

জুমু‘আর সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্ত পাঁচটি। যথা:

১- ওয়াক্ত।

২- নিয়াত।

৩- মুকিম হওয়া।

৪- ‘উরফ তথা প্রথাগতভাবে যতজন লোক জমায়েত হলে জামা‘আত হয় ততজন লোক একত্রিত হওয়া।

৫- জুমু‘আর সালাতের পূর্বে দু’টি খুৎবা দেওয়া। এতে আল্লাহর প্রশংসা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ ও সালাম, কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ ও আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বনের অসিয়ত করা। জুমু‘আর সালাতে কিরাত এমন উচ্চস্বরে পড়া যাতে এ সালাতের জন্য শর্তানুযায়ী সংখ্যক লোক শুনতে পায়। ইমাম খুৎবা দেওয়ার সময় কথা বলা ও মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে যাওয়া হারাম। জুমু‘আর সালাত যোহর সালাতের স্থলাভিষিক্ত। কেউ ইমামের সাথে জুমু‘আর সালাতের এক রাকাত পেলে সে জুমু‘আর সালাত পেয়েছে বলে গণ্য হবে। আর যদি এক রাকাতের কম পায় তাহলে যোহর সালাতের নিয়ত করবে এবং চার রাকাত সালাত আদায় করবে।

দুই ’ঈদের সালাত

দু’ঈদের সালাত শরী‘আতসম্মত হওয়ার হিকমত:

ঈদের সালাত দীন ইসলামের অন্যতম বাহ্যিক নিদর্শন এবং উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতে রমযান মাসের সাওম পালন ও আল্লাহর ঘরের হজ

আদায়ের মাধ্যমে মহান মালিক আল্লাহর শুকরিয়া আদায় হয়। এছাড়াও ঈদে রয়েছে মুসলিমের মধ্যে পরস্পর ভালোবাসা, সহমর্মিতা, দয়াশীলতা, বহু লোকের সমাবেশ ও আত্মার পবিত্রতার আহ্বান।

ঈদের সালাতের হুকুম:

ঈদের সালাত ফরযে কিফায়া, অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক আদায় করলে এলাকার সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর খলিফাগণ এ সালাত সর্বদা আদায় করেছেন। আর সব মুসলিম নারী-পুরুষের ওপর ঈদের সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। শরী'আত মুকিম লোকদের জন্য এ সালাত বিধিবদ্ধ করেছেন; মুসাফিরের জন্য নয়।

ঈদের সালাতের শর্তাবলী:

জুমু'আর সালাতে যেসব শর্ত রয়েছে ঈদের সালাতেও সেসব শর্ত প্রযোজ্য। তবে ঈদের দুই খুৎবা সুন্নাত এবং এ খুৎবাদ্বয় সালাতের পরে দিতে হয়।

ঈদের সালাতের ওয়াক্ত:

প্রত্যুষে সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠলে ঈদের সালাতের সময় শুরু হয় এবং সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত এ সালাত পড়া যায়। ঈদের দিনে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে যদি ঈদের দিন সম্পর্কে জানা যায় তাহলে পরের দিন এ সালাত যথাসময় কাযা করবে।

ঈদের সালাতের পদ্ধতি:

ঈদের সালাত দুই রাকাত। উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত,

«صلاة الفطر والأضحى ركعتان، ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى»

"ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাত দুই রাকাত, দুই রাকাত। তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষ্য মতে সে দুই রাকাতই পূর্ণ সালাত;

সংক্ষেপ নয়। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে নতুন কিছু রটনা করলো সে বিফল হলো”।[1] এ সালাত খুৎবার আগে পড়তে হয়। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমার পরে ও আউযুবিল্লাহ এর আগে ছয় তাকবীর দিবে এবং দ্বিতীয় রাকাতে কিরাত পড়ার আগে পাঁচ তাকবীর বলবে।

ঈদের সালাত আদায়ের স্থান:

ঈদের সালাত মাঠে আদায় করতে হয়, তবে প্রয়োজনে মসজিদে আদায় করাও জায়েয।

দু’ঈদের সালাতের সুন্নাতসমূহ:

সালাতের আগে পরে বেশি করে তাকবীর দেওয়া ও দু’ ঈদের রাতে উচ্চস্বরে তাকবীর বলা সুন্নাত। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ ١٨٥﴾ [البقرة: ١٨٥]

“আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ করো এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করো।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

ইমাম আহমাদ রহ. বলেছেন, ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উভয় ঈদে তাকবীর দিতেন।

তাছাড়া আরও সুন্নাত হচ্ছে, যুলহজ মাসের দশ দিন তাকবীর দেওয়া। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ ٢٨﴾ [الحج : ٢٨]

“আর নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।” [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ২৮]

আর আইয়্যামুত তাশরীকের নির্ধারিত তাকবীর সালাতের পরে দিতে হয়। এ তাকবীর ঈদুল আযহার দিনের সাথে নির্দিষ্ট। ইহরাম থেকে মুক্ত ব্যক্তি

---

[1] ইবন মাজাহ, ইকামাতুস সালাহ ওয়াসসুন্নাতু ফিহা, হাদীস নং ১০৬৪; আহমদ, ১/৩৭।

আরাফাতের দিন ফজর সালাতের পর থেকে আইয়্যামুত তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত এ তাকবীর বলবে।

ঈদের দিনে মুসল্লিগণের জন্য তাড়াতাড়ি ঈদগাহে যাওয়া সুন্নাত; কিন্তু ইমাম সালাতের সময় হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করবে। ঈদগাহে গমনকারী পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া ও সুন্দর কাপড় পরিধান করা সুন্নাত, তবে মহিলারা তাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করবে না।

ঈদের সালাতের সুন্নাতসমূহ:

ঈদুল আযহার সালাত আগে আগে পড়া আর ঈদুল ফিতরের সালাত দেরি করে পড়া সুন্নাত। ঈদুল ফিতরের সালাতে যাওয়ার আগে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খাওয়া আর ঈদুল আযহার সালাতের আগে কিছু না খেয়ে কুরবানীর গোশত দিয়ে খাওয়া সুন্নাত।

ইস্তিস্কা বা বৃষ্টিপ্রার্থনার সালাত

ক- ইস্তিস্কা বা বৃষ্টিপ্রার্থনার সালাত শরী‘আতসম্মত হওয়ার হিকমত:

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং অভাব-অনটনে, বিপদে-আপদে তাকে সর্বদা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন ও তাঁর কাছে আকুতি-মিনতি করার স্বভাবজাত করেই সৃষ্টি করেছেন। ইস্তিস্কা বা বৃষ্টিপ্রার্থনার সালাত মানুষের সে স্বভাবের এক বহিঃপ্রকাশ। মুসলিমগণ এ সালাতের মাধ্যমে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে তার মহান রব আল্লাহর কাছে বৃষ্টিপ্রার্থনা করে।

খ- ইস্তিস্কা বা বৃষ্টিপ্রার্থনার সালাতের অর্থ:

সালাত, দো‘আ, ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে কোনো দেশ ও জাতির জন্য মহান আল্লাহর কাছে পানি প্রার্থনা করা।

গ- ইস্তিস্কা বা বৃষ্টিপ্রার্থনার সালাতের হুকুম:

ইস্তিস্কা বা বৃষ্টিপ্রার্থনার সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এ সালাত আদায় করেছেন ও মানুষের মাঝে ঘোষণা দিয়েছেন এবং এ সালাতের জন্য তিনি মুসল্লা তথা মাঠে গিয়েছেন।

ঘ- ইস্তিস্কা সালাতের সময়, পদ্ধতি ও বিধি-বিধান:

ইস্তিস্কার সালাত ঈদের সালাতের মতোই।

ঙ- ইস্তিস্কা সালাতের ঘোষণা:

ইস্তিস্কা সালাতের কিছুদিন আগেই ইমাম লোকজনকে এ সালাতের ঘোষণা দেওয়া মুস্তাহাব। মানুষকে গুনাহ ও যুলুম- অত্যাচার থেকে তাওবা করার আহ্বান করা, সাওম পালন, দান-সদকা করা ও ঝগড়া-ঝাটি পরিহার করার আহ্বান করা। কেননা গুনাহ অনুর্বরতা ও অনুৎপাদনের কারণ যেমনিভাবে আল্লাহর আনুগত্য কল্যাণ ও বরকতের কারণ।

কুসূফ তথা সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের সালাত

ক- সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের সালাতের পরিচিতি, হুকুম ও শরী‘আতসম্মত হওয়ার হিকমত:

কুসূফ অর্থ সূর্য বা চন্দ্রের আলো চলে যাওয়া, নিভে যাওয়া। এটা মহান আল্লাহ তা‘আলার একটি মহা নিদর্শন। এ সালাত মানুষকে এ জীবনের পরিবর্তনের তথা কিয়ামতের ভয়াবহ দিবসের জন্য প্রস্তুতি, আল্লাহর কাছে বিনীত হওয়া ও মহাবিশ্বের মহাপরিচালনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে আহ্বান করে। মহান আল্লাহই যে একমাত্র ইবাদতের হকদার এ সালাত তাঁরই অন্যতম আহ্বান। সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হলে জামা‘আতের সাথে এ সালাত পড়া সুন্নাত। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيۡلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُۚ لَا تَسۡجُدُواْ لِلشَّمۡسِ وَلَا لِلۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ٣٧﴾ [فصلت: ٣٧]

“আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা না সূর্যকে সাজদাহ করবে, না চাঁদকে। আর তোমরা আল্লাহকে সাজদাহ কর যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদাত কর”। [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৭]

খ- সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের সালাতের ওয়াক্ত:

সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের শুরু থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত এর সময় অবশিষ্ট থাকে। সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ শেষ হয়ে গেলে এ সালাতের কাযা নেই এবং আলোকিত হয়ে গেলেও এ সালাত পড়ার নির্দেশ নেই, কেননা তখন এ সালাতের ওয়াক্ত চলে যায়।

গ- সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের সালাতের বর্ণনা:

দু’রাকাত সালাত পড়তে হয়। প্রথম রাকাতে উচ্চস্বরে সূরা আল-ফাতিহা ও দীর্ঘ সূরা পড়তে হয়, অতঃপর দীর্ঘ রুকু করে মাথা উঠিয়ে সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদা ও রাব্বানা লাকাল হামদ পড়বে। অতঃপর সূরা ফাতিহা পড়ে দীর্ঘ সূরা পড়বে। অতঃপর রুকু করবে, অতঃপর রুকু থেকে মাথা উঠাবে। অতঃপর দু’টি দীর্ঘ সাজদাহ দিবে। অতঃপর প্রথম রাকাতের মতো দ্বিতীয় রাকাত পড়বে, তবে কিরাত, রুকু, সাজদাহ ইত্যাদি প্রথম রাকাতের চেয়ে তুলনামূলক কম দীর্ঘ করবে। এ সালাতের অন্য পদ্ধতিও আছে। তবে এটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ পদ্ধতি। যদি তিন বা চার বা পাঁচ বার রুকু করা হয় তবে প্রয়োজন হলে তাতে কোনো অসুবিধে নেই।

জানাযা

ক- মানুষ যতই দীর্ঘ হায়াতপ্রাপ্ত হোক তাকে মরতে হবেই:

মানুষকে কর্মক্ষেত্র দুনিয়া থেকে ফলাফল প্রাপ্তির স্থান আখিরাতে যেতেই হবে। এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের অধিকার হলো সে অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করবে এবং সে মারা গেলে তার জানাযায় উপস্থিত হবে।

□অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করতে যাওয়া, তাকে তাওবা ও অসিয়াতের উপদেশ দেওয়া সুন্নাত।

□কারো মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তাকে ডান কাতে কিবলামুখী করে শোয়ানো সুন্নাত, যদি এতে তার কষ্ট না হয়। কষ্ট হলে চিৎ হয়ে কিবলার দিকে পা দিয়ে শোয়াবে। মাথা সামান্য উচুঁ করে রাখবে। তাকে কালেমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” তালকীন দিবে। পানি বা শরবত দিয়ে গলা ভিজাবে। তার কাছে সূরা ইয়াসীন পড়বে।

□মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে সুন্নাত হলো তার চোখ বন্ধ করে দেওয়া, মাথা ও থুতনি বন্ধনি দ্বারা বেধে দেওয়া, শরীরের জোড়াগুলো আলতোভাবে নরম করে দেওয়া, মাইয়্যেতকে মাটি থেকে কোনো কিছুর উপর রাখা, তার পরনের কাপড় খুলে আলাদা কাপড় দ্বারা সতর ঢেকে দেওয়া, খাটের উপর রাখা সম্ভব হলে ডান দিক কিবলামুখী করে অথবা চিৎ করে শুয়ে কিবলার দিকে পা বিছিয়ে দিবে।

খ- মাইয়্যেতকে গোসল দেওয়া:

পুরুষ মাইয়্যেতের অসিয়তকৃত ব্যক্তি তাকে গোসল দেওয়ার ব্যাপারে বেশি হকদার, অতঃপর তার বাবা, অতঃপর তার দাদা, অতঃপর তার নিকটাত্মীয়। মহিলা মাইয়্যেতের অসিয়তকৃত মহিলা ব্যক্তি তাকে গোসল দেওয়ার ব্যাপারে বেশি হকদার, অতঃপর তার মা, অতঃপর তার দাদী, অতঃপর তার নিকটাত্মীয়

মহিলারা তাকে গোসল দিবে। মুসলিম স্বামী-স্ত্রী একজন অন্যজনকে গোসল দিতে পারবে।

গোসলদানকারী বিবেকসম্পন্ন, ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী, বিশ্বস্ত ও গোসলদানে পারদর্শী হতে হবে।

মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক কাফিরকে গোসল দেওয়া বা দাফন কাপন পরানো হারাম, বরং মাটিতে পুতে রাখার মতো কাউকে পাওয়া না গেলে মুসলিম ব্যক্তি তাকে মাটিতে পুতে রাখবে।

গ- মাইয়্যেতকে গোসলের সুন্নাত পদ্ধতি:

প্রথমে তার লজ্জাস্থান ঢেকে দেবে, অতঃপর তার মাথাটা বসার মতো করে উপরের দিকে উঠাবে এবং আস্তে করে পেটে চাপ দিবে, যাতে করে পেটের ময়লা বেরিয়ে যায়। এরপর বেশি করে পানি ঢেলে তা পরিস্কার করে নিবে। তারপর হাতে কাপড় জড়িয়ে বা হাত মোজা পরে তা দিয়ে উভয় লজ্জাস্থানকে (দৃষ্টি না দিয়ে) ধৌত করবে। তারপর আরেকটি নেকড়া হাতে নিয়ে তাকে অযু করিয়ে নিবে, যা মুস্তাহাব। তারপর গোসলের নিয়ত করবে এবং 'বিসমিল্লাহ' বলবে। পানি, বরই পাতা বা সাবান দিয়ে গোসল করাবে। প্রথমে মাথা ও দাড়ি ধৌত করবে। অতঃপর ডানপাশ, অতঃপর বামপাশ ধৌত করবে। অতঃপর প্রথমবারের মতো করে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ধৌত করবে। এতে যদি পূর্ণরূপে পরিস্কার না হয় তবে পরিস্কার হওয়া পর্যন্ত ধৌত করতে হবে। শেষবারের সময় পানির সাথে কাফুর বা সুগন্ধি মিশাবে। মাইয়্যেতের মোচ বা নখ বড় হলে তা কেটে দিবে অতঃপর কাপড় দিয়ে মুছে দিবে। মহিলাদের চুল তিনটি বেনী করে দিবে এবং পিছনের দিক থেকে মুড়িয়ে ঢেকে দিবে।

ঘ- মাইয়্যেতের কাফন:

পুরুষকে তিনটি সাদা লেফাফা বা কাপড়ে কাফন পরানো সুন্নাত। কাফনের কাপড়ে সুগন্ধি মিশ্রিত করবে, অতঃপর কাপড় তিনটি একটির ওপর অন্যটি

বিছাবে। এতে হানূত তথা সুগন্ধি মিশাবে। অতঃপর মৃতব্যক্তিকে এসব লিফাফার উপর সোজা করে চিৎ করে শোয়াবে। তার দুই নিতম্বের মাঝে তুলা দিবে এবং পাজামার রশির মতো রশি দিয়ে নেকড়া বা তুলা বেধে দিবে। তার সতর ঢেকে দিবে এবং সমস্ত শরীরে সুগন্ধি মাখবে। অতঃপর সবচেয়ে নিচের বামপাশের কাপড় ভাজ করে ডান দিকে দিবে এবং ডানপাশের কাপড় ভাজ করে বাম দিকে দিবে। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাপড় ভাজ করে দিবে। মাথার দিকে একটু বেশি রাখবে এবং কাফন আড়াআড়ি মুড়িয়ে ভাজ করে দিবে, তবে কবরে নামানোর পরে মোড়ানো বাঁধ খুলে দিবে। শিশুকে একটি কাফন পরাবে, তাকে তিনটি কাফন পরানোও জায়েয।

মহিলাকে প্রথমে লুঙ্গি (যা নিচে থাকবে) পড়াবে, অতঃপর কামীছ (জামা), অতঃপর খেমার বা ওড়না (যা দিয়ে মাথা ঢাকবে), অতঃপর কামীছ (জামা) এবং দু'টি বড় লেফাফা বা কাপড়, অতঃপর কামীছ (জামা), অতঃপর ওড়না দিয়ে ঢেকে দিবে, অতঃপর দু'টি বড় লেফাফা দিয়ে পেচিয়ে দিবে। ছোট মেয়েকে একটি কামিজ ও দু'টি লেফাফা দিবে।

পুরুষ হোক বা নারী, মাইয়্যেতকে একবার গোসল দিলেই যথেষ্ট হবে। এমনিভাবে সমস্ত শরীর ঢেকে যায় এমন কাপড় হলে নারী বা পুরুষ উভয়কেই এক কাপড়ে কাফন পরানো যথেষ্ট।

অকালপ্রসূত ভ্রূণ যদি চার মাস অতিক্রান্ত করে মারা যায় তবে তাকে মৃত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তাকে গোসল দিবে ও জানাযা পড়বে।

৬- জানাযার সালাতের বর্ণনা:

সুন্নাত হলো, ইমাম পুরুষের মাথা বরাবর দাঁড়াবে। আর মহিলার মধ্যবর্তী স্থান বরাবর দাঁড়াবে। চার তাকবীরের সাথে জানাযা আদায় করবে এবং প্রতি তাকবীরে হাত উত্তোলন করবে। প্রথম তাকবীর দিয়ে আঊযুবিল্লাহ্... বিসমিল্লাহ

পাঠ করে নিরবে সূরা আল-ফাতিহা পড়বে, তবে সানা পড়বে না। দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে পড়বে:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

“হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের ওপর সালাত পেশ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর বংশধরদের ওপর সালাত পেশ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতিপ্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের ওপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই আপনি অতিপ্রশংসিত, অতি মর্যাদায় অধিকারী”।[1]

এরপর তৃতীয় তাকবীর দিয়ে এ দু‘আ পাঠ করবে:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ»

“ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের জীবিত ও মৃতদের ক্ষমা করুন। আমাদের ছোট ও বড়, পুরুষ ও স্ত্রী, উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলকে ক্ষমা করুন। ইয়া আল্লাহ!

[1] সহীহ বুখারী, আহাদীসুল আম্বিয়া, হাদীস নং ৩১৯০; সহীহ মুসলিম, সালাত, হাদীস নং ৪০৬; তিরমিযী, সালাত, হাদীস নং ৪৮৩; নাসাঈ, আস-সাহু, হাদীস নং ১২৮৮; আবু দাউদ, সালাত, হাদীস নং ৯৭৬; ইবন মাজাহ, ইকামাতুস সালাহ ওয়াস-সুন্নাতু ফিহা, হাদীস নং ৯০৪; আহমদ, ৪/২৪৪; দারেমী, সালাত, হাদীস নং ১৩৪২।

আপনি আমাদের মাঝে যাকে জীবিত রাখেন, তাকে ঈমানের উপর জীবিত রাখুন এবং যাকে মৃত্যু দেন, তাকে ইসলামের ওপর মৃত্যু দান করুন”।[1]

«اللهُمَّ، اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وعَذَابِ النَّارِ، وأفسح له في قبره ونور له فيه».

“হে আল্লাহ! তাকে মাফ করে দাও ও তার প্রতি দয়া কর। তাকে নিরাপদ রাখ ও তার ত্রুটি মার্জনা কর। তাকে উত্তম সামগ্রী দান কর ও তার প্রবেশস্থলকে প্রশস্ত করে দাও। তাকে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধুয়ে মুছে দাও এবং গুনাহ থেকে এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দাও যেরূপ সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। তার ঘরকে উত্তম ঘর পরিণত করে দাও, তাকে তার পরিবার থেকে উত্তম পরিবার দান কর, তার জোড়ার তুলনায় উত্তম জোড়া প্রদান কর। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবর ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। তার জন্য কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তার কবরকে আলোকময় করে দাও”।[2]

মাইয়্যেত শিশু হলে (من توفيته منا فتوفه عليهما) এর পরে বলবে:

«اللّٰهُمَّ اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وشفيعا مجابا، اللّٰهُمَّ ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم».

---

[1] তিরমিযী, জানায়েয, হাদীস নং ১০২৪; নাসাঈ, জানায়েয, হাদীস নং ১৯৮৬; আহমদ, ৫/৪১২; আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩২০১, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৪৯৮।

[2] মুসলিম, হাদীস নং ৯৬৩; তিরমিযী, জানায়েয, হাদীস নং ১০২৪; নাসাঈ, জানায়েয, হাদীস নং ১৯৮৬; আহমদ, ৫/৪১২;

“হে আল্লাহ আপনি এ শিশুকে তার পিতামাতার জন্য ধন-ভাণ্ডার, অগ্রগামী সম্পদ (আমল) ও শাফা‘আতকারী করে দিন। হে আল্লাহ এর দ্বারা তার পিতামাতার আমলের পাল্লা ভারী করুন, তাদের প্রতিদান বাড়িয়ে দিন, তাকে সৎপূর্বসূরী মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করুন, তাকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ভরণ-পোষণ দায়িত্বে রাখুন, আপনার রহমাতে তাকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।”[1]

এরপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে সামান্য একটু চুপ থেকে ডান দিকে সালাম ফিরাবে।

চ- জানাযার সালাতের ফযীলত:

জানাযার সালাত আদায়কারীর জন্য রয়েছে এক কিরাত সাওয়াব। আর কিরাত হলো অহুদ পাহাড় পরিমাণ। আর কেউ জানাযার সালাত আদায় করে দাফন পর্যন্ত মাইয়্যেতের সাথে থাকলে তার জন্য রয়েছে দুই কিরাত।

মাইয়্যেতকে চারজন বহন করা সুন্নাত। একই ব্যক্তি পরিবর্তন করে খাটের চারপাশ বহন করা সুন্নাত। জানাযা নিয়ে দ্রুত চলা সুন্নাত। পায়ে হাটা ব্যক্তিরা জানাযার সামনে চলবে এবং আরোহীরা জানাযার পিছনে চলবে।

ছ- কবর, দাফন ও কবরে যেসব কাজ করা নিষিদ্ধ:

কবর গভীর হওয়া ওয়াজিব। কবরের নিম্নভাগে একটি গর্ত করা যা কিবলামুখী করে মাইয়্যেতকে রাখার জন্য করা হয়, একে ‘লাহাদ’ কবর বলে। এ কবর ‘শাক্ক’ বা সরাসরি খাদ করে দেওয়া কবরের চেয়ে উত্তম। কবরে মাইয়্যেতকে নামানো ব্যক্তি বলবে:

«بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ»

[1] এ দো‘আর সূত্র লেখক উল্লেখ করেন নি, তবে দো‘আর প্রথম কিছু অংশ মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং ৬৫৮৯; সুনান বাইহাকী আল-কুবরা, হাদীস নং ৬৭৯৪ এ আছে। -অনুবাদক

“আল্লাহর নামে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিল্লাতের অর্ন্তভুক্ত করে রাখলাম”।

ডান কাতে শোয়ায়ে কিবলামুখী করে রাখবে। অতঃপর কবরে মাটি দিবে, অতঃপর দাফন করবে। কবর জমিন থেকে এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করবে এবং এতে পানি ছিটিয়ে দিবে।

কবরের উপর গৃহ নির্মাণ, চুনকাম করা, হাটা, সালাত পড়া, কবরের উপর মসজিদ তৈরি করা, কবরকে বরকতের স্থান মনে করা, বাতি জ্বালানো, গোলাপ ফুল ছড়ানো ও কবরে তাওয়াফ ইত্যাদি করা হারাম।

মাইয়্যেতের পরিবার পরিজনের জন্য খাবার তৈরি করে পাঠানো সুন্নাত। পক্ষান্তরে মাইয়্যেতের পরিবার পরিজন আগত মানুষের জন্য খাবার তৈরি করা মাকরূহ।

কবর যিয়ারতের সময় এ দো‘আ পড়া সুন্নাত:

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللّٰهُمَّ لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم »

“হে কবরের অধিবাসী মুমিনগণ! আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। নিশ্চয় আমরাও আপনাদের সাথে এসে মিলিত হব ইনশাআল্লাহ। আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের উপরে আল্লাহ রহম করুন। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের বিনিময় হতে বঞ্চিত করবেন না এবং এরপর আর আমাদেরকে ফিতনায় পতিত করবেন না এবং আমাদের ও তাদেরকে ক্ষমা করে দিন।”[1]

---

[1] মুসলিম, ত্বহারাত, হাদীস নং ২৪৯; নাসাঈ, ত্বহারাত, হাদীস নং ১৫০; আবু দাউদ, জানায়েয, হাদীস নং ৩২৩৭; ইবন মাজাহ, যুহুদ, হাদীস নং ৪৩০৬; আহমদ, ২/৩০০; মালেক, ত্বহারাত, হাদীস নং ৬০।

মৃতব্যক্তির পরিবার পরিজনকে দাফনের আগে ও পরের তিনদিন সমবেদনা জানানো সুন্নাত। তবে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে এর পরেও সমবেদনা জানানো যাবে।

কারো কোনো মুসীবত আসলে নিম্নোক্ত দো‘আ বলা সুন্নাত:

«إنا لله وإنا إليه راجعون، اللَّهُمَّ أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرا منها»

“নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমাকে বিপদে ধৈর্য ধারণের সাওয়াব দান করুন এবং এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিয়ে ধন্য করুন”।[1]

মাইয়্যেতের জন্য কাঁদা জায়েয, তবে মাতম করে জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, গালে চড় বা আঘাত করা, উচ্চস্বরে কাঁদা ইত্যাদি হারাম।

=====

[1] সহীহ মুসলিম, জানায়েয, হাদীস নং ৯১৮; তিরমিযী, জানায়েয, হাদীস নং ৯৭৭; আবু দাউদ, জানায়েয, হাদীস নং ৩১১৯; ইবন মাজাহ, মা জাআ ফিল জানায়েয, হাদীস নং ১৪৪৭; আহমদ, ৬/৩০৯; মালিক, জানায়েয, হাদীস নং ৫৫৮।

৩- যাকাত

যাকাতের আহকাম

যাকাতুল ফিতর

ইসলামের তৃতীয় রুকন যাকাত

ক- যাকাত শরী‘আতসম্মত হওয়ার হিকমত:

ইসলামী শরী‘আত কিছু সুউচ্চ ও সুমহান হিকমতের কারণে যাকাত ফরয করেছে। নিম্নে কিছু হিকমত আলোচনা করা হলো:

১- কৃপণতা, লোভ-লালসার ব্যধি থেকে মানুষের আত্মিক পবিত্রতা অর্জন।

২- গরীব-দুঃখী মানুষের দুঃখ কষ্ট ভাগাভাগি করে সমবেদনা জ্ঞাপন, অভাবী, দুর্ভিক্ষ ও বঞ্চিত মানুষের অভাব পূরণ করা।

৩- সর্বসাধারণের জন্য কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা; যার ওপর ভিত্তি করবে মুসলিম উম্মাহর জীবন ও সৌভাগ্য।

ধনীদের কাছে অঢেল সম্পদ, ব্যবসায়ী ও পেশাদারদের হাতে যাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে না থাকে, ধনীদের মাঝেই যেন আবর্তিত না হয়, এ জন্য ইসলাম যাকাতের ব্যবস্থা করেছে।

খ- যাকাতের পরিচিতি:

নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে, নিসাব পরিমাণ সম্পদ থেকে, নির্দিষ্ট পরিমাণ ফরয সম্পদ, যাকাতের নির্ধারিত হকদারকে প্রদান করা।

এটা বান্দার জন্য পবিত্রকরণ ও তার আত্মার পরিশুদ্ধি। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ١٠٣﴾ [التوبة: ١٠٣]

“তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ কর। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৩]

গ- ইসলামে যাকাতের অবস্থান:

এটি ইসলামের পাঁচটি রুকনের অন্যতম একটি রুকন। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে সালাতের পাশাপাশি যাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

ঘ- যাকাতের হুকুম:

নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে নিসাব পরিমাণ সম্পদের যাকাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আল্লাহ ফরয করেছেন। আল্লাহ তাঁর কিতাবে যাকাত ফরয করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত গ্রহণ করেছেন। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, সুস্থ-অসুস্থ বা জ্ঞানশূন্য যাদেরই ওপর যাকাত ফরয তাদের থেকে যাকাত গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]

"তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ কর। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে"। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৩]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ﴾ [البقرة: ٢٦٧]

"হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি জমিন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৬৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ﴾ [البقرة: ١١٠]

"আর তোমরা সালাত কায়েম করো ও যাকাত দাও"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১১০]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো (সত্য) ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর

রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, হজ করা এবং রমযান মাসের সিয়াম পালন করা”।[1]

যেসব সম্পদের ওপর যাকাত ফরয:

চার ধরণের সম্পদের ওপর যাকাত ফরয। সেগুলো হলো:

মূল্যবান সম্পদ, পশু, জমিন থেকে উৎপাদিত ফসল ও ব্যবসায়িক সম্পদ।

১- মূল্যবান সম্পদ হলো সোনা, রুপা ও কাগজের নোট:

বিশ মিসকাল সোনা হলে এতে যাকাত ফরয হবে। এতে (দশমাংশের চতুর্থাংশ হারে) চল্লিশ ভাগের একভাগ তথা ২.৫% হারে যাকাত ফরয হবে।

রুপা দুইশত দিরহাম হলে এতেও (দশমাংশের চতুর্থাংশ হারে) চল্লিশ ভাগের একভাগ তথা ২.৫% হারে যাকাত ফরয হবে।

বর্তমানে প্রচলিত কাগজের নোট মূল্যবান সম্পদের হিসেবে হিসেব করা হবে। এ নোটের সম্পদ যদি সোনা বা রুপা যেকোন একটির নিসাবের সমান হয় এবং এক বছর অতিক্রম করে তবে এতে (দশমাংশের চতুর্থাংশ হারে) চল্লিশ ভাগের একভাগ তথা ২.৫% হারে যাকাত ফরয হবে।

২- চতুষ্পদ প্রাণির যাকাত:

উট, গরু ও ছাগল মরুভূমি ও প্রাকৃতিক চারণভূমি থেকে খাদ্য আহরণকারী হলে এতে যাকাত ফরয হয়। নিসাব পূর্ণ হলে এবং একবছর অতিক্রান্ত হলে নিম্নোক্ত হিসাব অনুযায়ী যাকাত আদায় করতে হবে:

ক- ছাগলের যাকাত:

৪০-১২০টি মেষের জন্য ১টি মেষ।

১২১-২০০টি মেষের জন্য ২টি মেষ।

২০১-৩০০টি মেষের জন্য ৩টি মেষ।

---

[1] সহীহ বুখারী, ঈমান, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসলিম, ঈমান, হাদীস নং ১৬; তিরমিযী, ঈমান, হাদীস নং ২৬০৯; নাসাঈ, ঈমান ও শারায়ে‘উহু, হাদীস নং ৫০০১; আহমদ, ২/৯৩।

৩০০ এর অতিরিক্ত হলে প্রতি একশতে ১টি করে মেষ দিতে হবে।

খ- গরুর যাকাত:

গরুর সর্বনিম্ন নিসাব ৩০ থেকে ৩৯টি গরুর জন্য 'তাবী' বা তাবী'আ (এক বছর বয়সী) ১টি গরু যাকাত দিতে হবে।

৪০-৫৯টি গরুর জন্য মুসিন্না বা দু'বছর বয়সী ১টি গরু যাকাত দিতে হবে।

৬০টি গরুর জন্য দু'টি তাবী' বা একবছর বয়সী ২টি গরু যাকাত দিতে হবে।

এভাবে প্রতি ৩০টির জন্য এক বছর বয়সী ১টি 'তাবী' বা তাবী'আ গরু এবং প্রতি ৪০টি গরুর জন্য একটি মুসিন্না বা দু'বছর বয়সী ১টি গরু যাকাত দিতে হবে।

গ- উটের যাকাত:

উটের সর্বনিম্ন নিসাব ৫টি থেকে ৯টি উটের জন্য পূর্ণ একবছর বয়সী ১টি ছাগল যাকাত দিতে হবে।

১০-১৪টি উটের জন্য ২টি ছাগল যাকাত দিতে হবে।

১৫-১৯টি উটের জন্য ৩টি ছাগল যাকাত দিতে হবে।

২০-২৪টি উটের জন্য ৪টি ছাগল যাকাত দিতে হবে।

২৫-৩৫টি উটের জন্য একটি বিনতে মাখাদ্ব উট বা এক বছর বয়সী ১টি স্ত্রী উট যাকাত দিতে হবে।

৩৬-৪৫টি উটের জন্য বিনতে লাবূন বা দু'বছর বয়সী ১টি স্ত্রী উট যাকাত দিতে হবে।

৪৬-৬০টি উটের জন্য হিক্কাহ বা তিন বছর বয়সী ১টি স্ত্রী উট যাকাত দিতে হবে।

৬১-৭৫টি উটের জন্য জায'আহ বা চার বছর বয়সী ১টি স্ত্রী উট যাকাত দিতে হবে।

৭৬-৯০টি উটের জন্য দু'টি বিনতে লাবূন বা দু'বছর বয়সী ২টি স্ত্রী উট যাকাত দিতে হবে।

৯১-১২০টি উটের জন্য দু'টি হিক্কাহ বা তিন বছর বয়সী ২টি স্ত্রী উট যাকাত দিতে হবে।

১২ এর পরে প্রতি ৪০টি উটে এক বিনতে লাবূন বা এক বছর বয়সী ১টি স্ত্রী উট, আর প্রতি ৫০টি উটে এক হিক্কাহ বা তিন বছর বয়সী ১টি স্ত্রী উট যাকাত দিতে হবে।

উট, গরু ও ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত চতুষ্পদ প্রাণি যদি ব্যবসা ও উৎপাদনশীল সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয় তবে এগুলো বছর অতিক্রম করলে এর মূল্য ধরে ২.৫% হিসেবে যাকাত দিবে।

আর যদি গৃহপালিত প্রাণি ব্যবসায়িক সম্পদ না হয় তবে এতে যাকাত নেই। স্ত্রী পশু যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে; শুধু গরুর যাকাতের ক্ষেত্রে এবং বিনতে লাবুনের পরিবর্তে ইবন লাবুন বা হিক্কাহ বা জিয'আ বা যাকাতের নিসাব পুরোটাই যদি পুরুষ পশু হয়, সে ক্ষেত্রেও পুরুষ পশু যাকাত আদায় করা যাবে।

৩- জমিন থেকে উৎপাদিত ফসলের যাকাত:

সমস্ত খাদ্যশস্য, ওজন করা ও গুদামজাত করা যায় এমন ফলমূল যেমন, খেজুর, কিসমিস ইত্যাদিতে নিসাব পূর্ণ হলে যাকাত ফরয। আর এর নিসাবের পরিমাণ হলো ৩০০ সা', রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সা' অনুযায়ী, যা প্রায় ৬২৪ কিলোগ্রাম।

নিসাব পূর্ণ করতে একই প্রকারের ফল একই বছরের সব ফল একত্র করা হবে। যেমন, সব ধরণের খেজুর।

খাদ্যশস্য ও ফলের যাকাতের পরিমাণ:

১- বিনা খরচে প্রাকৃতিক বৃষ্টির পানিতে বা ঝর্ণার পানিতে উৎপাদিত খাদ্যশস্য ও ফলমূলে ‘উশর বা এক দশমাংশ (১০%) হারে যাকাত ফরয।

২- শ্রম নির্ভর সেচ, যেমন কূপ ইত্যাদি থেকে পানি এনে সেচ দেওয়া সাপেক্ষে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাতে যাকাতের পরিমাণ হলো অর্ধ ‘উশর (৫%)।

৩- যেসব খাদ্যশস্য ও ফলমূল কিছু বিনা খরচে বৃষ্টির পানিতে এবং কিছু শ্রম নির্ভর সেচ, যেমন কূপ ইত্যাদি থেকে পানি এনে সেচ দেওয়া সাপেক্ষে উৎপন্ন হয়েছে তাতে ৭.৫% হারে যাকাত ফরয।

খাদ্যশস্যে যখন দানা পরিপক্ক হয় এবং খোসাযুক্ত হয় এবং ফলমূল যখন পরিপক্ক হয়ে খাওয়ার উপযোগী হয় তখন এতে যাকাত ফরয হয়।

শাকসব্জি ও ফলমূল ব্যবসার জন্য হলে কেবল এতে যাকাত ফরয হবে, তখন এতে নিসাব পূর্ণ হলে ও বছর অতিক্রান্ত হলে এর মূল্য থেকে ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে।

সামুদ্রিক মূল্যবান জিনিস যেমন, মণিমুক্তা, নীলকান্তমণি ও মাছ ইত্যাদিতে কোনো যাকাত নেই। তবে এগুলো যদি ব্যবসার জন্য হয় তবে এতে ব্যবসার মালের মতো নিসাব পূর্ণ হলে ও বছর অতিক্রান্ত হলে ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে।

রিকায তথা গুপ্তধন বলতে জমিনের নিচে পুঁতে রাখা ধন সম্পদ। এ সম্পদ কম হোক বা বেশি হোক কেউ তা পেলে ফাইয়ের খাত তথা গরীব, মিসকীন ও কল্যাণকর কাজে এক পঞ্চমাংশ (২০%) হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

৪- ব্যবসায়িক সম্পদের যাকাত:

ব্যবসায়িক সম্পদ বলতে পশু, খাদ্য, পানীয় ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বেচা-কেনার মাধ্যমে লাভের উদ্দেশ্যে জমা রাখা হয়। কারো কাছে ব্যবসায়িক সম্পদ নিসাব পরিমাণ থাকলে এবং তা একবছর অতিবাহিত হলে গরীবের সর্বাধিক সুবিধাজনক হিসেবে বছর শেষে সমস্ত মূল্যমানের ওপর ২.৫% হিসেবে যাকাত

ফরয হবে। তবে ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত সে ব্যবসায়িক পণ্য থেকে দেওয়াও জায়েয।

যেসব ব্যবসায়িক পণ্য নিজের প্রয়োজনে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে; ব্যবসার নিয়তে নয়, এতে যাকাত নেই।

যখন পশু ও ব্যবসায়ী পণ্য নিসাব পরিমাণ হয়ে যাবে, তখন পশু থেকে আগত বাচ্চা এবং ব্যবসা থেকে অর্জিত লভ্যাংশে ‘বছর পূর্ণ হওয়ার বিষয়টি’ মূলবস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। (অর্থাৎ পশুর বাচ্ছা ও ব্যবসায় অর্জিত লভ্যাংশের জন্য আলাদা বছর পূর্ণ হতে হবে না। মূল পশু ও মূল ব্যবসায়ী পণ্যের বছর পূর্ণ হওয়াই যথেষ্ট)

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী:

(১) স্বাধীন, (২) মুসলিম, (৩) নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক, (৪) যাকাতের সম্পদ পুরোপুরি মালিক হওয়া এবং (৫) উক্ত নিসাব পরিমাণ মালের এক বছর অতিক্রম হওয়া। তবে খাদ্য শস্য ও ফলমূল এবং রিকাযে এক বছর অতিক্রম হওয়া শর্ত নয়।

যাকাত আদায়

ক- যাকাত আদায়ের সময়:

মানত ও কাফফারার মতো যাকাত তাৎক্ষণিক আদায় করা ফরয। কেননা আল্লাহর আদেশ সাধারণভাবে তাৎক্ষণিক আদায় করাই কামনা করে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [البقرة: ٢٧٧]

“এবং তোমরা যাকাত দাও”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৭]

তবে যাকাত প্রদানকারী প্রয়োজনের সময়ে দেওয়ার জন্য, আত্মীয়দের দেওয়ার জন্য ও প্রতিবেশীর জন্য বিলম্ব করতে পারবে।

খ- যাকাত অস্বীকারকারীর হুকুম:

কেউ জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃত ভাবে যাকাত ফরয হওয়া অস্বীকার করলে সে যাকাত আদায় করলেও আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও উম্মাহর ইজমাকে অস্বীকার এ মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে কাফির হয়ে যাবে এবং তাকে তাওবা করতে হবে; কিন্তু তাওবা না করলে তাকে কুফরীর কারণে হত্যা করা হবে। আর কেউ যাকাত ফরয হওয়াকে স্বীকার করে; কিন্তু কৃপণতা ও অবজ্ঞার কারণে যাকাত আদায় করতে অস্বীকৃতি জানালে তার থেকে জোর করে যাকাত আদায় করা হবে এবং হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাকে শাস্তি ও তিরস্কার করা হবে।

শিশু ও পাগলের পক্ষ থেকে তার অভিভাবক যাকাত আদায় করে দিবে।

গ- যাকাত আদায়ের সময় যে কাজ করা সুন্নাত:

১- যাকাত না আদায়ের অপবাদ থেকে মুক্তি পেতে প্রকাশ্যে যাকাত আদায় করা সুন্নাত।

২- যাকাতের হকদারের কাছে যথাযথভাবে যাকাত পৌঁছাতে নিজেই তদারকি করা।

৩- যাকাত প্রদানের সময় এ দো‘আ পড়া:

«اللَّهُمَّ اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما»

“হে আল্লাহ এটাকে গণীমত হিসেবে পরিণত কর, জরিমানা হিসেবে নয়”।

৪- যাকাত গ্রহীতা যাকাত গ্রহণের সময় এ দো‘আ পড়া:

« أجرك الله فيما أعطيت. بارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا».

“তুমি যা দিয়েছ তাতে আল্লাহ প্রতিদান দিন, যা বাকী রেখেছ তাতে বরকত দিন আর তা তোমার জন্য পবিত্রকারী বানিয়ে দিন।”

৫- নিজের যেসব আত্মীয়-স্বজনের দায়-দায়িত্ব নেওয়া অত্যাবশ্যকীয় নয় সেসব গরীব আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত প্রদান করা সুন্নাত।

যাকাতের খাতসমূহ:

যাকাতের খাত হলো আটটি। আল্লাহ তা‘আলা এসব খাত সম্পর্কে বলেছেন,

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠﴾ [التوبة: ٦٠]

“নিশ্চয় সদকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস ‘আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬০]

এরা হলো:

১- ফকির: ফকির হলো যারা নিজের ও পরিবারের অবশ্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের সামান্য কিছু পায় না।

২- মিসকীন: যারা নিজের ও পরিবারের অবশ্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের কিছু পায়ে থাকে বা অর্ধেকের বেশি পায়, তবে তাদের অভাব থাকে।

৩- যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী: যারা যাকাতের সম্পদ পাহারা দেন, যাকাত জমা করেন, অভাবগ্রস্তদের মাঝে বণ্টন করেন ইত্যাদি যাকাতের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি যাদেরকে বাইতুল মাল থেকে বেতন নির্ধারণ করে দেওয়া হয় নি।

৪- দীনের প্রতি যাদের অন্তর আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য: নিজগোত্রে সম্মান ও আনুগত্যের পাত্র এমন নেতৃবর্গ যাদেরকে অর্থদান করলে ইসলাম গ্রহণ করার অথবা মুসলিমদেরকে নির্যাতন করা থেকে বিরত থাকার অথবা তাদের ঈমানে মজবুতি সৃষ্টি হওয়ার অথবা তাদের অনুরূপ কারো ইসলাম গ্রহণ আশা করা যায়।

৫- গোলাম আযাদ: তারা হলো মুকাতিব দাস (যে দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য টাকা দেওয়ার ব্যাপারে মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এমন) দাসকে তার দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের টাকা থেকে দেওয়া যাবে।

৬- ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি: ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দু'ধরণের:

ক- অন্য মানুষের মধ্যে সমঝোতা করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়েছে।

খ-যার জিম্মায় ঋণ রয়েছে এবং সে তা আদায় করতে সক্ষম নয় তাকে তার ঋণগ্রস্ততা থেকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের সম্পদ দেওয়া যাবে।

৭- আল্লাহ রাস্তায় দান: (আল্লাহর রাস্তা) বলতে বুঝায় আল্লাহর রাস্তায় বিনা বেতনে জিহাদকারী লোক, আল্লাহর পথের দা'য়ী ও তাদের কাজে প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যয়ে তাদেরকে যাকাতের অর্থ দেওয়া হবে।

৮- মুসাফির: সফর অবস্থায় যে নিঃস্ব ও অর্থশূন্য হয়ে পড়েছে এবং নিজ দেশে যাওয়ার কোনো সম্পদ তার কাছে নেই এমন ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে।

যাকাতুল ফিতর

১- যাকাতুল ফিতর শরী'আতসম্মত হওয়ার হিকমত:

যাকাতুল ফিতর শরী'আতসম্মত হওয়ার হিকমত হলো এ সাদাকা সাওম পালনকারীর আত্মাকে ভুলত্রুটি ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে পবিত্র করে। এমনিভাবে ঈদের দিনে ফকির ও মিসকীনকে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া থেকে মুক্ত রাখে।

২- যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ ও যেসব খাদ্য থেকে আদায় করা যাবে:

যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ হলো প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ থেকে এক সা' করে আদায় করতে হবে। আর সা' হচ্ছে চার মুদ্দ। আর এক সা' প্রায় তিন কিলো।

দেশের প্রচলিত মানব-খাদ্য থেকে, যেমন গম, খেজুর, চাল, কিসমিস অথবা পনির দ্বারা আদায় করতে হবে।

৩- যাকাতুল ফিতর কখন ওয়াজিব ও কখন আদায় করতে হয় :

ঈদুল ফিতরের রাত আগমনের সাথে সাথেই যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়। আর যাকাতুল ফিতর আদায়ের সময় হচ্ছে ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্ব থেকে। কারণ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা এভাবে করতেন। আর আদায়ের উত্তম সময় হচ্ছে ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর ও ঈদের সালাতের সামান্য পূর্ব পর্যন্ত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে ঈদের সালাতে বের হওয়ার পূর্বে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৪- কাদের ওপর যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব:

ঈদের দিন ও রাতে যে মুসলিম ব্যক্তি তার নিজের ও পরিবারের খাবারের অতিরিক্ত খাদ্যের মালিক হবে তার ওপর ও তার দাস-দাসী, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলের ওপর যাকাতুল ফিতর ওয়াজিব। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের পক্ষ থেকেও যাকাতুল ফিতর আদায় করা মুস্তাহাব।

৫- যাকাতুল ফিতর বণ্টনের খাতসমূহ:

সাধারণত যাকাতের খাতসমূহই হলো যাকাতুল ফিতরের খাত। তবে অন্য খাতের চেয়ে ফকির ও মিসকীনকে প্রদান করা উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم».

"তোমরা তাদেরকে এ দিনে (ঈদের) কারো কাছে হাত পাতা থেকে মুক্ত রাখো।"

=====

৪- সাওম

সাওমের হুকুম ও বিধিবিধান

ইসলামের চতুর্থ রুকন রমযানের সাওম

সাওমের পরিচিতি ও সাওম ফরয হওয়ার ইতিহাস:

১- সাওম পরিচিতি:

শাব্দিক অর্থ: বিরত থাকা। আর পারিভাষিক অর্থে সাওম হলো: ইবাদতের নিয়াতে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য, পানীয় স্বামী-স্ত্রীর মিলন ও সাওম ভংগকারী যাবতীয় জিনিস থেকে বিরত থাকা।

২-সাওম ফরয হওয়ার ইতিহাস:

আল্লাহ তা'আলা উম্মাতে মুহাম্মাদীর ওপর সাওম ফরয করেছেন যেমনিভাবে পূর্ববতী উম্মাতের ওপর সাওম ফরয করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣]

“হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩]

আর এটি ছিল দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে।

সাওমের উপকারিতা:

সাওমের রয়েছে আত্মিক, সামাজিক ও শারীরিক উপকার। সেগুলো:

- সাওমের আত্মিক উপকারের মধ্যে রয়েছে এটি মানুষকে ধৈর্য শিক্ষা দেয় ও তাকে শক্তিশালী করে। ব্যক্তিকে আত্মনিয়ন্ত্রণ শিক্ষা দেয় এবং এর ওপর চলতে সাহায্য করে। সাওমের মাধ্যমে মানুষ তাকওয়া অর্জন করে এবং সাওম মানুষকে তাকওয়া শিক্ষা দেয়।
- সাওমের সামাজিক উপকারের মধ্যে রয়েছে এটি জাতিকে শৃংখলা, একতা, ন্যায়পরায়নতা ও সমতা বজায় রাখতে অভ্যস্ত করে। মুমিনের

মধ্যে ভালোবাসা, রহমত ও সচ্চরিত্র ইত্যাদি গুণ অর্জনে সাহায্য করে। এছাড়াও সমাজকে সব ধরণের অন্যায় ও বিশৃংখলা থেকে মুক্ত রাখে।

- সাওমের শারীরিক উপকারিতা হলো: সাওম মানুষের নাড়িভুঁড়ি পরিষ্কার করে ও পাকস্থলী সুস্থ রাখে। শরীরকে অতিরিক্ত ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখে ও অতিরিক্ত ওজন কমায়।

রমযান মাস শুরু হওয়া সাব্যস্ত করার পদ্ধতি:

দু'টি পদ্ধতির যে কোনো একটির দ্বারা রমযান মাস শুরু হওয়া সাব্যস্ত হবে। তাহলো:

১- আগের মাস তথা শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করে, একত্রিশতম দিনকে রমযানের প্রথম দিন ধরে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে সাওম পালন শুরু করবে।

২- শাবান মাসের ত্রিশতম রাতে চাঁদ দেখা গেলে রমযান সাব্যস্ত হবে এবং পরের দিন থেকে সাওম পালন করা ফরয হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]

“সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا رأيتم الهلال فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا»

“যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন সাওম পালন করবে, আবার যখন তা দেখবে তখন সাওম ভঙ্গ করে ঈদুল ফিতর পালন করবে। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তাঁর সময় হিসাব করে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।”[1]

---

[1] সহীহ বুখারী, সাওম, হাদীস নং ১৮০১; সহীহ মুসলিম, সিয়াম, হাদীস নং ১০৮০; নাসাঈ, সিয়াম, হাদীস নং ২১২০; আহমদ, ২/১৪৫; মালিক, সিয়াম, হাদীস নং ৬৩৪; দারেমী, সাওম, হাদীস নং ১৬৮৪।

রমযানের চাঁদ কোনো এলাকার লোকজন দেখলে তাদের উপর সাওম শুরু করা ফরয; কেননা চাঁদের উদয় স্থান স্থানভেদে ভিন্ন। যেমন এশিয়াতে চাঁদের উদয় স্থান ইউরোপের উদয় স্থান থেকে আলাদা, আবার আফ্রিকার উদয় স্থান আমেরিকার উদয় স্থান থেকে ভিন্ন। এ কারণে প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য আলাদা হুকুম। তবে যদি পৃথিবীর সব মুসলিম একই চাঁদ দেখে এক দিনে সবাই সাওম পালন করে তাহলে তাতে ইসলামের সৌন্দর্য্য, পরস্পর ভালোবাসা, একতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রকাশ পায়।

রমযানের চাঁদ একজন বা দু'জন সৎ ও ন্যায়পরায়ণলোকের দেখার সাক্ষ্য দিলেই তা যথেষ্ট হবে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনের সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে রমযানের সাওম পালনের অনুমতি দিয়েছেন।[1] কিন্তু শাওয়াল মাসে ঈদের চাঁদ দেখার জন্য কমপক্ষে দু'জন সৎ লোকের সাক্ষ্য লাগবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সৎলোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করে সাওম ভঙ্গ করতে অনুমতি দেন নি।[2]

রমযান মাসের সাওম পালন ফরয:

রমযান মাসের সাওম পালন ফরয হওয়া কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা তা প্রমাণিত। এটি ইসলামের অন্যতম একটি রুকন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ﴾ [البقرة: ١٨٥]

"রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫]

---

[1] সহীহ মুসলিম।

[2] সহীহ মুসলিম।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»

"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। এ কথার সাক্ষ্য দওেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো (সত্য) ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, হজ করা এবং রমযান মাসের সিয়াম পালন করা"।[1]

সাওমের রুকনসমূহ:

১- নিয়ত করা। আল্লাহর আদেশ পালন করতে ও তার নৈকট্য লাভের প্রত্যাশায় অন্তরে সাওমের দৃঢ় সংকল্প করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

"প্রত্যেক কাজ নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল"[2]

২- বিরত থাকা: সাওম ভঙ্গকারী কারণ খাদ্য, পানীয় ও স্বামী-স্ত্রীর মিলন ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা।

৩- সময়: এখানে সময় বলতে দিনের বেলাকে বুঝানো হয়েছে। সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়।

সাওম ফরয হওয়ার শর্তাবলী:

সাওম ফরয হওয়ার শর্ত চারটি। তা হলো:

---

[1] সহীহ বুখারী, ঈমান, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসলিম, ঈমান, হাদীস নং ১৬; তিরমিযী, ঈমান, হাদীস নং ২৬০৯; নাসাঈ, ঈমান ওয়াশারায়ি'উহু, হাদীস নং ৫০০১; আহমদ, ২/৯৩।

[2] সহীহ বুখারী, বাদউল অহী, হাদীস নং ১; সহীহ মুসলিম, আল-ইমারাহ, হাদীস নং ১৯০৭; তিরমিযী, ফাদাইলুল জিহাদ, হাদীস নং ১৬৪৭; নাসাঈ, ত্বাহারাত, হাদীস নং ৭৫; আবু দাউদ, তালাক, হাদীস নং ২২০১; ইবন মাজাহ, যুহুদ, হাদীস নং ৪২২৭; আহমদ, ১/৪৩।

১- ইসলাম।

২- বালেগ তথা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

৩- আকেল তথা জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।

৪- সাওম পালনে সক্ষম হওয়া।

তাছাড়া মহিলাদের সাওম শুদ্ধ হতে হায়েয ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়াও শর্ত।

সাওম শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী:

১- ইসলাম।

২- রাত থেকেই সাওমের নিয়ত করা।

৩- আকেল তথা জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।

৪- ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

৫- হায়েয থেকে পবিত্র হওয়া।

৬- নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া।

সাওমের সুন্নাতসমূহ:

১- তাড়াতাড়ি ইফতার: সুর্যাস্তের সাথে সাথেই দ্রুত ইফতার করা।

২- তাজা বা শুকনা খেজুর বা পানি দিয়ে ইফতার করা। এগুলো ক্রমান্বয়ে অর্থাৎ একটি পাওয়া না গেলে অন্যটি দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব। তিন বা পাঁচ বা সাত ইত্যাদি বেজোড় সংখ্যক দিয়ে ইফতারি করা মুস্তাহাব।

৩- ইফতারের সময় দো‘আ করা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতারের সময় এ দো‘আ করতেন,

«اللّٰهُمَّ لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم».

“হে আল্লাহ! আমরা আপনার জন্যই সাওম পালন করলাম, আপনার দেওয়া রিযিকে ইফতার করলাম। অতএব, আপনি আমাদের সাওম কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী”।[1]

৪- সাহরী খাওয়া: সাওম পালনের নিয়তে শেষরাতে কিছু খাওয়া ও পান করার নাম সাহরী।

৫- রাতের শেষভাগে বিলম্বে সাহরী খাওয়া।

সাওমের মাকরূহসমূহ:

সাওম পালনকারীর জন্য কিছু কাজ করা মাকরূহ। কারণ এর মাধ্যমে তার সাওম নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে; যদিও এ কাজগুলো সরাসরি সাওম নষ্ট করে না। তন্মধ্যে:

১- অযুর সময় কুলি ও নাকে পানি দেওয়ায় অতিরঞ্জিত করা।

২- স্ত্রীকে চুম্বন করা। কেননা এতে যৌন উত্তেজনায় মযী বের হওয়া বা মিলনের সম্ভাবনা থাকে, ফলে কাফফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

৩-যৌন উত্তেজনাসহ স্ত্রীর প্রতি পলকহীনভাবে একাধারে তাকিয়ে থাকা।

৪- যৌন কাজের চিন্তা করা।

৫- হাতের দ্বারা স্ত্রীকে স্পর্শ করা বা তার শরীর স্পর্শ ও ঘর্ষণ করা।

যেসব ওযরগ্রস্ত ব্যক্তির সাওম ভঙ্গ করা জায়েয:

১- হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত নারীর সাওম ভঙ্গ করা ফরয।

২- কাউকে ধ্বংস থেকে উদ্ধার বা রক্ষা করতে হলে যদি সাওম ভঙ্গ করতে হয় তবে তখন তার জন্য সাওম ভঙ্গ করা ওয়াজিব। যেমন, ডুবে যাওয়া বা এ ধরণের ব্যক্তিকে রক্ষা করা।

৩- যে সফরে সালাত কসর করা সাওম ভঙ্গ করা জায়েয সে ধরনের সফরকারীর জন্য সাওম ভঙ্গ করা সুন্নাত।

---

[1] আবু দাউদ, সাওম, হাদীস নং ২৩৫৮।

৪- সাওম পালনে রোগ বৃদ্ধি হতে পারে এমন আশঙ্কা থাকলে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য সাওম ভঙ্গ করা বৈধ।

৫- মুকিম ব্যক্তি দিনের বেলায় সফর করলে তার জন্য উত্তম হলো সাওম ভঙ্গ না করা, যেহেতু এ ব্যাপারে আলেমদের মতানৈক্য রয়েছে।

৬- গর্ভবতী অথবা দুগ্ধদানকারী নারী যদি তার নিজের ক্ষতির আশঙ্কা করে অথবা তার সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করে তবে তার জন্য সাওম ভঙ্গ করা বৈধ হবে। যদি নিজের ক্ষতির কোনো ভয় না থাকে, শুধু বাচ্চার ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে সে অবস্থায় তাকে কাযা করার সাথে ফিদিয়া তথা প্রতিদিনের সাওমের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্যদান করতে হবে।

সাওম ভঙ্গের কারণসমূহ:

সাওম ভঙ্গের কারণ নিম্নরূপ:

১- রিদ্দা তথা মুরতাদ হয়ে গেলে সাওম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

২- মারা গেলে।

৩- সাওম ভেঙ্গে ফেলার দৃঢ় নিয়ত করলে।

৪- সাওম রাখা বা ভেঙ্গে ফেলার ব্যাপারে সন্দিহান হলে।

৫- ইচ্ছাকৃত বমি করলে।

৬- পশ্চাত পথ দিয়ে বা ইনজেকশন করে শরীরে খাদ্য ঢুকালে।

৭- হায়েয ও নিফাসের রক্ত বের হলে।

৮- মুখে কফ জমা করে গিলে ফেললে।

৯- সিঙ্গা লাগালে সিঙ্গাকারী ও সিঙ্গাকৃত ব্যক্তি উভয়ের সাওম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১০- স্ত্রীর দিকে বারবার চেয়ে থাকার কারণে ইচ্ছাকৃত বীর্যপাত হলে সাওম ভেঙ্গে যাবে।

১১- স্ত্রীকে চুম্বন বা তার শরীর স্পর্শ বা হস্তমৈথুন বা যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্য পথে সহবাস করার কারণে মনি (বীর্যপাত) বা মযী বের হলে।

১২- পেটে, গলায় বা ব্রেণে খাদ্য ও পানীয় জাতীয় কিছু চলে গেলে সাওম ভেঙ্গে যাবে।

সতর্কীকরণ:

রমযানে দিনের বেলায় যৌনাঙ্গ বা যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্য পথে ইচ্ছাকৃত সহবাস করলে সাওম ভেঙ্গে যাবে এবং এতে কাযা ও কাফফারা দু'টি-ই আদায় করতে হবে। এসব কাজ যদি ভুলে করে ফেলে তাহলে তার সাওম সহীহ হবে এবং তাকে কাযা ও কাফফারা কোনোটিই করতে হবে না।

কোনো নারীকে রমযানে দিনের বেলায় জোর করে সহবাস করা হলে বা না জানার কারণে সহবাস করলে বা সে নারী ভুলে সহবাস করলে তার সাওম সঠিক। তবে সে নারীকে জোরপূর্বক সহবাস করতে বাধ্য করা হলে তার ওপর শুধু কাযা করা ওয়াজিব হবে। আর সে ইচ্ছাকৃত এসব কাজে অনুগত হলে তাকে কাযা ও কাফফারা উভয়টি করতে হবে।

সাওমের কাফফারা হলো একজন মুমিন দাস মুক্ত করা। দাস মুক্ত করতে অক্ষম হলে দু'মাস একাধারে সাওম পালন করা। দু'মাস সাওম পালনে অক্ষম হলে ৬০ জন মিসকীনকে খাবার প্রদান করা। ৬০ জন মিসকীনকে খাবার প্রদান করতেও যদি অক্ষম হয় তবে তার থেকে কাফফারা রহিত হয়ে যাবে।

স্বামী যদি যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্য পথে সহবাস করে তাহলে স্বামীকে তা কাযা করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে।

রমযানের কাযা তাৎক্ষণিক আদায় করে দেওয়া সুন্নাত। কোনো ওযর ব্যতীত ইচ্ছাকৃত পরবর্তী রমযান পর্যন্ত বিলম্ব করলে তাকে কাযার সাথে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করতে হবে।

কেউ মানতের সাওম বা মানতের হজ যিম্মায় রেখে মারা গেলে তার অভিভাবকেরা তা কাযা করে দিবে।

যেসব দিন সাওম পালন করা মুস্তাহাব, মাকরূহ ও হারাম

ক- যেসব দিন সাওম পালন করা মুস্তাহাব:

নিম্নোক্ত দিনসমূহে সাওম পালন করা মুস্তাহাব:

- আরাফার দিনের সাওম। আর তা হচ্ছে হাজী ব্যতীত অন্যরা নয় তারিখ সাওম পালন করবে।
- মুহাররম মাসের নয় ও দশ বা দশও এগারো তারিখ সাওম পালন করা।
- শাওয়ালের ছয়টি সাওম।
- শা'বান মাসের প্রথমার্ধে অর্থাৎ পনের তারিখের আগে সাওম পালন।
- মুহাররম মাসে সাওম পালন করা।
- প্রতিমাসের বেজোড় তিনদিন অর্থাৎ (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) সাওম পালন করা।
- প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করা।
- একদিন সাওম পালন করা আবার একদিন সাওম পালন না করা অর্থাৎ একদিন পরপর সাওম রাখা।
- বিবাহ করতে অক্ষম যুবক-যুবতীদের সাওম পালন করা।

যেসব সাওম পালন করা মাকরূহ:

- আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত হাজী ব্যক্তির আরাফার দিনে সাওম পালন।
- শুধু জুমু'আর দিন সাওম রাখা।
- শা'বান মাসের শেষের দিন সাওম পালন।

এসব দিন সাওম পালন করা মাকরূহ তানযিহী।

আর নিম্নের দিনগুলোতে সাওম পালন করা মাকরূহ তাহরিমী। সেগুলো হচ্ছে:

১- সাওমুল বিসাল তথা দু বা ততোধিক দিন বিনা ইফতারে লাগাতার সাওম পালন করা।

২- ইয়ামুশ-শাক তথা শা‘বান মাসের ত্রিশতম দিনে সাওম পালন করা।

৩- সারা বছর বিরতিহীনভাবে একাধারে সাওম পালন করা।

৪- স্বামী উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর নফল সাওম পালন করা।

যে দিনগুলোতে সাওম পালন করা হারাম:

আর নিম্নের দিনগুলোতে সাওম পালন করা হারাম। সেগুলো হচ্ছে:

১- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে সাওম পালন করা হারাম।

২- আইয়্যামে তাশরীক তথা যিলহজের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ এ তিনদিন হাদই যবেহ করতে অক্ষম তামাত্তু ও কারিন হাজীগণ ব্যতীত অন্যদের সাওম পালন করা হারাম।

৩- মহিলাদের জন্য হায়েয ও নিফাসের দিনে সাওম পালন করা হারাম।

৪- অসুস্থ ব্যক্তি সাওম পালন করলে যদি তার অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে তার সাওম পালন করা হারাম।

=====

৫- ই'তিকাফ ও এর বিধি-বিধান

প্রকারভেদ ও শর্তাবলী

ই‘তিকাফ

ই‘তিকাফের পরিচিতি:

শাব্দিক অর্থে ই‘তিকাফ অর্থ বাস করা, লেগে থাকা, অবস্থান করা ও আটকে রাখা।

পারিভাষিক অর্থে ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নিয়াতে ও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মসজিদে অবস্থান করা।

ই‘তিকাফ শরী‘আতসম্মত হওয়ার হিকমত:

১- ই‘তিকাফের মাধ্যমে দুনিয়ার কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর ইবাদতে নিজের অন্তরকে নিয়োজিত করা।

২- মহান মাওলা আল্লাহর সমীপে তার আদেশ পালন, তার দরবারে তাঁর দয়া ও রহমত লাভের প্রত্যাশায় নিজেকে সমর্পণ করা।

ই‘তিকাফের প্রকারভেদ:

১- ওয়াজিব ই‘তিকাফ: মানতের ই‘তিকাফ পূর্ণ করা ওয়াজিব। যেমন কেউ বলল, আমি যদি অমুক কাজে সফল হই তাহলে তিনদিন ই‘তিকাফ করব অথবা যদি আমার অমুক কাজটি সহজ হয় তাহলে আমি ই‘তিকাফ করব।

২- সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ: এর উত্তম সময় হলো রমযান মাসের শেষ দশদিন ই‘তিকাফ করা।

ই‘তিকাফের রুকনসমূহ:

১- ই‘তিকাফকারী: কেননা ই‘তিকাফ এমন কাজ যার জন্য একজন ই‘তিকাফকারী প্রয়োজন।

২- মসজিদে অবস্থান করা: আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন,

«لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة».

“জামাত হয় এমন মসজিদ ছাড়া কোনো ই‘তিকাফ নেই”।[1]

---

[1] মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ৮০০৯; মুসান্নাফ ইবন আবু শাইবা, সহীহ বুখারী, হাদীস

কেননা ই‘তিকাফকারী যখন জামা‘আত হয় এমন মসজিদে ই‘তিকাফ করবে তখন সে সালাতের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে পারবে। আর সালাতের পূর্ণ প্রস্তুতি হলো জামা‘আতে সালাত আদায় করা।

৩- ই‘তিকাফের স্থান: ই‘তিকাফকারী যেখানে ই‘তিকাফের জন্য অবস্থান করে।

ই‘তিকাফ শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী:

১- ই‘তিকাফকারী মুসলিম হওয়া। অতএব কাফিরের ই‘তিকাফ সহীহ হবে না।

২- ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। অতএব, পাগল ও শিশুর ই‘তিকাফ শুদ্ধ হবে না।

৩- পুরুষের জন্য এমন মসজিদে ই‘তিকাফ করতে হবে যেখানে জামা‘আত অনুষ্ঠিত হয়। [নারীর জন্য যে কোনো মসজিদ হতে পারবে]

৪- ই‘তিকাফকারীকে জুনুবী তথা অপবিত্রতা, হায়েয ও নিফাস থেকে পবিত্র হতে হবে।

যেসব কারণে ই‘তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যায়:

১- সহবাস করা, যদিও এতে বীর্য নির্গত না হয়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ﴾ [البقرة: ١٨٧]

“আর তোমরা মাসজিদে ই‘তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৭]

২- সহবাসের দিকে ধাবিত করে এমন সব কাজ করা।

৩- বেহুশ ও পাগল হওয়া, চাই মাদক বা অন্য যেকোন কারণে হোক।

৪- মুরতাদ হলে।

৫- ওযর ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হওয়া।

যেসব বৈধ ওযরে মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে:

নং ৯৬৭৩।

যেসব কারণে ই'তিকাফকারী মসজিদ বা ই'তিকাফের স্থান থেকে বের হতে পারবে তা তিন ধরণের। সেগুলো হচ্ছে:

১- শর'ঈ ওযর: যেসব মসজিদে জুমু'আ ও ঈদের সালাত আদায় হয় না সেসব মসজিদে ই'তিকাফ করলে জুমু'আ ও ঈদের সালাতের জন্য বের হতে পারবে। এর কারণ ই'তিকাফ হচ্ছে গুনাহের কাজ ছেড়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ইচ্ছা করা। আর জুমু'আ ও ঈদের সালাত ছেড়ে দেওয়া নাফরমানী ও গুনাহের কাজ যা ই'তিকাফের সাথে করা চলে না।

২- স্বভাবগত ওযর: যেমন পেশাব, পায়খানা বা স্বপ্নদোষ হলে ফরয গোসল করা ইত্যাদির জন্য মসজিদে ব্যবস্থা না থাকলে বের হওয়া। তবে এর শর্ত হচ্ছে যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকু সময় মসজিদের বাহিরে থাকা, এর চেয়ে বেশি সময় না থাকা।

৩- জরুরি ওযর: যেমন কেউ ই'তিকাফ চালিয়ে গেলে তার সম্পদ হারিয়ে যাওয়া বা ধ্বংস হওয়া বা নিজের ক্ষতির আশঙ্কা করলে তখন বের হতে পারবে।

====

৬- হজ

হজের বিধি-বিধান

‘উমরা ও এর বিধি-বিধান

ইসলামের পঞ্চম রুকন হজ

১- হজের পরিচিতি:

হজ (حج) শব্দের আভিধানিক অর্থ: ইচ্ছা করা ও কোনো গন্তব্যের দিকে গমন করা। কোনো কাজ বারবার করা।

পারিভাষিক অর্থে: বিশেষ ইবাদত আদায়ের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট সময়ে মক্কা গমন করার ইচ্ছা করা।

২- ইসলামে হজের অবস্থান:

হজ ইসলামের পঞ্চ রুকনের মধ্যে পঞ্চম রুকন। নবম হিজরিতে হজ ফরয হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ ٩٧﴾ [آل عمران: ٩٧]

“এবং সামর্থ্যবান মানুষের ওপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ করা ফরয”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো (সত্য) ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, হজ করা এবং রমযান মাসের সিয়াম পালন করা”।[1]

৩- হজের হুকুম:

আল্লাহ তার (সক্ষম) বান্দার ওপর জীবনে হজ পালন করা ফরয করেছেন।

« الحج مَرَّةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ»

---

[1] সহীহ বুখারী, ঈমান, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসলিম, ঈমান, হাদীস নং ১৬; তিরমিযী, ঈমান, হাদীস নং ২৬০৯; নাসাঈ, ঈমান ওয়াশারায়ে‘উহু, হাদীস নং ৫০০১; আহমদ, ২/৯৩।

“হজ জীবনে একবার, কেউ এর চেয়ে বেশি করলে তা তার জন্য অতিরিক্ত (নফল)”।[1]

হজের অর্থ: বিশেষ ইবাদত আদায়ের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট সময়ে মক্কা গমন করার ইচ্ছা করা।

৪- উমরা:

উমরার পরিচিতি: উমরার শাব্দিক অর্থ পরিদর্শন করা, সাক্ষাৎ করা। আর পারিভাষিক অর্থে উমরা হলো: কতিপয় নির্দিষ্ট কাজ নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পালন করা।

‘উমরার হুকুম:

জীবনে একবার উমরা পালন করা ওয়াজিব।

৫- হজ ও উমরা শরী‘আতসম্মত হওয়ার হিকমত:

ইসলামে হজ ও উমরা শরী‘আতসম্মত হওয়ার অন্যতম হিকমত হলো পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মানুষের অন্তরকে পবিত্র করা যাতে আখিরাতে আল্লাহর দেওয়া সম্মানিত স্থানের (জান্নাতের) অধিবাসী হওয়া যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

« من حج هذا البيت فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

“যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ পালন করলো এবং অশালীন কথাবার্তা ও গুনাহ থেকে বিরত রইল, সে নবজাতক শিশু, যাকে তার মা এ মুহূর্তেই প্রসব করেছে, তার ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরবে”।[2]

---

[1] নাসাঈ, মানাসিকুল হজ, হাদীস নং ২৬২০; আবু দাউদ, মানাসিক, হাদীস নং ১৭২১; ইবন মাজাহ, মানাসিক, হাদীস নং ২৮৮৬; আহমদ, ১/২৯১; দারেমী, মানাসিক, হাদীস নং ১৭৮৮।

[2] সহীহ বুখারী, হজ, হাদীস নং ১৫২১; সহীহ মুসলিম, হজ, হাদীস নং ১৩৫০; তিরমিযী, হজ, হাদীস নং ৮১১; নাসাঈ, মানাসিকুল হজ, হাদীস নং ২৬২৭; ইবন মাজাহ, মানাসিক, হাদীস নং ২৮৮৯; আহমদ, ২/৪১০; দারেমী, মানাসিক, হাদীস নং ১৭৯৬।

৬- হজ ও উমরা ফরয হওয়ার শর্তাবলী:

হজ ও উমরা ফরয হওয়ার শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১- ইসলাম।

২- আক্বল বা জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া।

৩- বালিগ হওয়া।

৪- হজে গমনের সামর্থ থাকা। অর্থাৎ হজে যাওয়া আসার যাতায়াত খরচ, খাদ্য ইত্যাদির সামর্থ্য থাকা।

৫- স্বাধীন হওয়া।

৬- উপরের পাঁচটি শর্তের সাথে মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত আরেকটি শর্ত রয়েছে, তা হলো মুহরিম থাকা। মুহরিম ব্যতীত হজ পালন করলে গুনাহগার হবে, যদিও তার হজ আদায় হয়ে যাবে।

- শিশু হজ করলে তার হজ নফল হিসেবে সহীহ হবে, তবে বালিগ হলে তার ওপর হজ পালন করা ফরয হবে।
- কারো ওপর হজ ফরয হওয়ার পরে হজ পালন না করে মারা গেলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তার পক্ষ থেকে হজ করানো ফরয।
- কেউ নিজে হজ পালন না করলে সে অন্যের পক্ষ থেকে হজ পালন করতে পারবে না। নফল হজ বা উমরা পালনের জন্য যেকোন কাউকে স্থলাভিষিক্ত করা সহীহ।

হজ তথা মানাসিকের প্রকারভেদ:

১- শুধু উমরা পালন করা।

২- শুধু হজ পালন করা।

৩- হজ ও উমরা একত্রে পালন করা।

৪- উমরা পালন করে কিছুদিন ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে আবার হজ পালন করা।

- শুধু শুধু উমরা পালন বছরের যে কোনো সময় করা যায়। তবে সর্বোত্তম উমরা হলো যা হজের সাথে বা রমযান মাসে পালন করা হয়।
- ইফরাদ হজ তথা শুধু হজ হলো হজের দিনে শুধু হজের জন্য ইহরাম বাঁধা, এর আগে বা পরে উমরা পালন না করা।
- আর কিরান তথা হজের সাথে উমরা হলো শুরু থেকেই হজ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধা এবং হজ ও উমরার কিছু কাজ একত্রে করা। ফলে হজ ও উমরার জন্য একবারই তাওয়াফ ও সা'ঈ করা।
- আর তামাত্তু হজ হলো সবচেয়ে উত্তম হজ। হজের মাসে প্রথমে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধা। অতঃপর উমরার জন্য সা'ঈ ও তাওয়াফ শেষে হালাল হয়ে যাওয়া। অতঃপর একই বছর যিলহজ মাসের আট তারিখ হজের জন্য ইহরাম বাঁধা এবং তাওয়াফ, সা'ঈ, আরাফাতের ময়দানে অবস্থান ইত্যাদি হজের কার্য সম্পন্ন করা। তামাত্তু ও কারিন পালনকারীর উপর হাদী যবেহ করা ওয়াজিব।

হজ ও উমরার রুকনসমূহ:

- হজের রুকন চারটি। সেগুলো হলো: ইহরাম, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা ও মারওয়ায় সা'ঈ ও 'আরাফায় অবস্থান। এ চারটি রুকনের কোনো একটি ছুটে গেলে হজ বাতিল হয়ে যাবে।
- উমরার রুকন তিনটি। সেগুলো হলো: ইহরাম, তাওয়াফ ও সা'ঈ। অতএব, এগুলো আদায় না করলে উমরা আদায় হবে না। এ সব রুকনের বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

প্রথম রুকন: ইহরাম

ইহরাম হলো: হজ বা উমরা পালনের নিয়াতে হজ বা উমরার কাজে প্রবেশের নিয়ত করা এবং সাধারণ সেলাই করা কাপড় ছেড়ে ইহরামের পোশাক পরিধান করা।

ইহরামের ওয়াজিবসমূহ:

ইহরামের ওয়াজিব তিনটি। সেগুলো হচ্ছে:

১- মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধা:

শরী‘আত প্রণেতা যেসব জায়গা থেকে হজ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধতে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং হজ বা উমরা পালনকারীকে ইহরামের নিয়ত ব্যতীত এ সব স্থান অতিক্রম করা জায়েয নেই।

২- সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করা:

পুরুষ মুহরিম সেলাইকৃত জামা, কামিছ, টুপিওয়ালা জামা, পাগড়ি পরবে না। কোনো কিছু দিয়ে মাথা ঢেকে রাখবে না। জুতো পরবে, চামড়ার মোজা বা কাপড়ের মোজা পরবে না, তবে জুতো না পেলে চামড়ার মোজা বা কাপড়ের মোজা পরতে পারবে। নারী নিকাব ও হাতমোজা পরবে না।

৩- তালবিয়া পাঠ করা। তালবিয়া হলো নিম্নোক্ত এ দো‘আ পড়া।

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ»

“আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত। আপনার কোনো শরীক নেই। নিশ্চয় প্রশংসা ও নি‘আমত আপনার এবং রাজত্বও, আপনার কোনো শরীক নেই”।

মুহরিম মিকাত থেকে ইহরাম পরিধান করার সময় তালবিয়া পড়বে এবং এ দো‘আ পাঠ না করে মিকাত অতিক্রম করবে না। পুরুষ উচ্চস্বরে এবং (নারীরা আস্তে আস্তে) বেশি বেশি পরিমাণে ও বার বার প্রত্যেক উঠা, বসা, চলা, ফেরা, সালাতের আগে-পরে ও কারো সাক্ষাতে তালবিয়া পাঠ করবে। উমরা আদায়কারী উমরার তাওয়াফ শেষ করলে তালবিয়া পাঠ শেষ করবে এবং হজ আদায়কারী জামরায়ে ‘আকাবাতে পাথর নিক্ষেপ শেষে তালবিয়া পাঠ সমাপ্ত করবে।

দ্বিতীয় রুকন: তাওয়াফ

তাওয়াফ হলো কা‘বা ঘরের চারপাশে সাতবার ঘোরা। এর সাতটি শর্ত। সেগুলো হচ্ছে:

১- তাওয়াফ শুরু করার নিয়ত করা।

২- ছোট বড় সব ধরণের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র থাকা।

৩- সতর ঢেকে রাখা। যেহেতু তাওয়াফ সালাতের মতোই।

৪- মসজিদের ভিতর দিয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা, যদিও বাইতুল্লাহ থেকে দুর দিয়ে হয়।

৫- তাওয়াফের সময় বাইতুল্লাহ যেন তাওয়াফকারীর বাম দিকে থাকে।

৬- তাওয়াফে সাতটি চক্কর দেওয়া।

৭- ধারাবাহিকভাবে ও বিরতিহীন তাওয়াফ করা। ওযর ব্যতীত বিলম্ব করবে না।

তাওয়াফের সুন্নাতসমূহ:

১- রমল করা: পুরুষদের জন্য তাওয়াফে কুদূম তথা আগমনি তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নাত। রমল হলো তাওয়াফের সময় দ্রুত পদে চলা। নারীরা রমল করবে না।[1]

২- ইযতিবা করা: তাওয়াফে কুদূমের সময় ইযতিবা করা। ইযতিবা হলো ডান বগলের নিচে চাদর রেখে ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখা। এটা শুধু পুরুষের জন্য প্রযোজ্য, নারীদের জন্য নয়। সাত বার তাওয়াফের পুরো সময়ই ইযতিবা করবে।

৩- হাজরে আসওয়াদ চুম্বন: তাওয়াফ শুরু করার সময় ও সম্ভব হলে প্রতি চক্করে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা। সম্ভব হলে রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা।

---

[1] ইমাম মুসলিম ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদ থেকে প্রথম তিন চক্কর রমল করেছেন এবং বাকী চারবার স্বাভাবিক হেঁটেছেন।

৪- প্রথম চক্কর তাওয়াফ শুরু করার সময় এ দো‘আ পড়া:

«بسم الله والله أكبر. اللّٰهُمَّ إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعا لسنة نبيك ﷺ».

“বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবর, হে আল্লাহ আপনার ওপর ঈমান, আপনার কিতাবের ওপর সত্যায়ন, আপনার ওয়াদা পূরণ ও আপনার নবীর অনুসরণে (আমি তাওয়াফ শুরু করছি)।”

৫- তাওয়াফের সময় দো‘আ করা: তাওয়াফের সময় আল্লাহর কাছে যে কোনো দো‘আ করতে পারে, তবে প্রত্যেক চক্কর শেষ করার সময় এ দো‘আ পড়া সুন্নাত:

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١﴾ [البقرة: ٢٠١]

“হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের ‘আযাব থেকে রক্ষা করুন”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২০১]

৬- তাওয়াফের সময় মুলতাযিমে দো‘আ করা। আর মুলতাযিম হলো হাজরে আসওয়াদ ও বাইতুল্লাহর দরজার মধ্যবর্তী জায়গা।

৭- সাত তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমে দু’রাকা‘আত সালাত আদায় করবে। এ সময় মাকামে ইবরাহীম তার ও কা‘বার মাঝখানে রেখে এর পিছনে দু রাকা‘আত সালাত আদায় করবে। প্রথম রাকা‘আতে সূরা আল-ফাতিহার পরে ‘সূরা আল-কাফিরূন’ এবং দ্বিতীয় রাকা‘আতে সূরা আল-ফাতিহার পরে সূরা আহাদ তথা কুল হুআল্লাহু আহাদ পড়বে।

৮- এ দু’রাকাত সালাত শেষে যমযমের পানি পান করবে।

৯- সা‘ঈ করার আগে হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে তা স্পর্শ করবে।

তৃতীয় রুকন: সা‘ঈ:

সা‘ঈ হলো সাফা ও মারওয়ার মাঝে ইবাদতের নিয়াতে হাঁটা। এটি হজ ও উমরার রুকন।

ক- সা‘ঈর শর্তাবলী:

সা‘ঈর শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১- নিয়ত করা: কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

“প্রত্যেক কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল”[1]

২- তাওয়াফ ও সা‘ঈর মধ্যে তারতীব ঠিক রাখা। আগে তাওয়াফ করা, পরে সা‘ঈ করা।

৩- সা‘ঈর সাত চক্করের মাঝে ধারাবাহিকতা ও বিলম্ব না করা, তবে সামান্য বিলম্বে কোনো অসুবিধে হবে না, বিশেষ করে তা যদি প্রয়োজনে করা হয়।

৪- সাত চক্কর পূর্ণ করা। সাতের কম করলে বা কোনটি আংশিক করলে সা‘ঈ আদায় হবে না। যেহেতু সা‘ঈ মূলত সাত চক্কর পূর্ণ করার সাথে শর্তযুক্ত।

৫- বিশুদ্ধ তাওয়াফের পরে হওয়া, চাই তা ওয়াজিব তাওয়াফ হোক বা সুন্নাত তাওয়াফ।

খ- সা‘ঈর সুন্নাতসমূহ:

সা‘ঈর সুন্নাতসমূহ নিম্নরূপ:

১- পুরুষের জন্য দুই সবুজ চিহ্নিত জায়গা যেখানে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের মা হাজের আলাইহাস সালাম পায়ের দ্বারা আঘাত করে চলেছেন সে জায়গা সাধ্যানুযায়ী দ্রুত অতিক্রম করা সুন্নাত। দুর্বল ও মহিলারা স্বাভাবিক গতিতে হাঁটবে।

---

[1] সহীহ বুখারী, বাদউল অহী, হাদীস নং ১; সহীহ মুসলিম, আল-ইমারাহ, হাদীস নং ১৯০৭; তিরমিযী, ফাদাইলুল জিহাদ, হাদীস নং ১৬৪৭; নাসাঈ, ত্বাহারাত, হাদীস নং ৭৫; আবু দাউদ, ত্বলাক, হাদীস নং ২২০১; ইবন মাজাহ, যুহুদ, হাদীস নং ৪২২৭; আহমদ, ১/৪৩।

২- দো‘আর জন্য সাফা ও মারওয়ায় উঠা।

৩- সাফা ও মারওয়ায় সাতবার সা‘ঈ করার সময় বেশি বেশি দো‘আ পড়া।

৪- সাফা ও মারওয়ায় তিনবার “আল্লাহু আকবর” ও এ দো‘আ পড়া:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

“আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। সকল বিষয়ের ওপর তিনি ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি এক। আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন ও তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রুদেরকে পরাজিত করেছেন”।[1]

৫- তাওয়াফের সাথে সাথেই সা‘ঈ করা। তবে কোনো শর‘ঈ ওযর থাকলে ভিন্ন কথা।

চতুর্থ রুকন: ‘আরাফাতের ময়দানে অবস্থান

‘আরাফাতের ময়দানে অবস্থান বলতে ৯ যিলহজ যোহরের পর থেকে ১০ই যিলহজ ঈদের দিন ফজরের সালাতের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের নিয়াতে কিছুক্ষণ থাকা। কেউ ঈদের দিনের ফজরের সালাতের আগে অবস্থান করতে না পারলে তার ‘আরাফাতের ময়দানে অবস্থান শুদ্ধ হবে না এবং তার হজ বাতিল বলে গণ্য হবে। তখন সে উমরা করে হালাল হয়ে যাবে। পরের বছর সে উক্ত হজ পালন করবে। হজের ইহরাম বাঁধার সময় বাধাপ্রাপ্ত হলে হালাল হয়ে যাওয়ার শর্ত না করে থাকলে হাদীও প্রদান করতে হবে। কেউ বাইতুল্লায় যেতে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে হাদী পাঠাবে এবং যেখানে বাধা পাবে সেখানেই হালাল হয়ে যাবে।

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮।

কেউ অসুস্থ বা অর্থ হারিয়ে যাওয়ার কারণে হজে আসতে বাধাগ্রস্ত হলে তখন সে শর্তকারী হলে (সময় এ কথা বলা: আমার গন্তব্য সেখানেই শেষ যেখানে আমি বাধাগ্রস্ত হবো) তখন সেখানে হালাল হয়ে যাবে, তাকে কিছু হাদী হিসেবে দিতে হবে না। আর যদি শর্ত না করে থাকে তাহলে হালাল হবে এবং তার সাধ্যমত হাদী পাঠাতে হবে।

হজের ওয়াজিবসমূহ:

হজের ওয়াজিব সাতটি। তাহলো:

১ - মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।

২- যে ব্যক্তি দিনের বেলায় 'আরাফাতে অবস্থান করবে তার জন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত 'আরাফাতে অবস্থান করা।

৩- কুরবানীর রাত মুযদালিফায় মধ্যরাতের বেশি অবস্থান করা।

৪- আইয়ামে তাশরীকে মিনার রাতগুলো মিনায় যাপন করা।

৫- ধারাবাহিকভাবে তিন জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

৬- মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা।

৭- বিদায়ী তাওয়াফ।

উমরার ওয়াজিবসমূহ:

উমরার ওয়াজিব দু'টি:

১- মক্কাবাসী হালাল এলাকা থেকে এবং মক্কার বাইরে থেকে আগতরা মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।

২- মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা।

কেউ উপরোক্ত রুকনের কোনো একটি ছেড়ে দিলে তার হজ ও উমরা আদায় হবে না।

কারো হজ ও উমরার ওয়াজিব ছুটে গেলে তাকে দম (প্রাণি যবাই) দিতে হবে। তবে সুন্নাত ছুটে গেলে তাকে কিছু দিতে হবে না।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ:

হজ বা উমরা অবস্থায় এসব নিষিদ্ধ কাজ করলে তার ওপর ফিদিয়া তথা যবেহ করা ওয়াজিব হয়। অথবা মিসকীনদের খাদ্য দান করতে হবে। অথবা সাওম পালন করবে। হজ অথবা উমরার ইহরাম বাঁধলে নিম্নোক্ত কাজসমূহ নারী পুরুষ উভয়ের জন্য করা হারাম:

১- শরীরের যেকোনো অঙ্গ থেকে চুল মুণ্ডানো, কাটা অথবা উপড়ে ফেলা।

২- হাত ও পায়ের নখ কাটা।

৩- এমন কোনো কাপড় দিয়ে পুরুষের মাথা ঢেকে রাখা যা মাথার সাথে লেগে থাকে। নারীদের চেহারা ঢেকে রাখা, তবে ভিনপুরুষ থাকলে ঢেকে রাখবে।

৪- পুরুষের ক্ষেত্রে সেলাই-করা পোশাক পরা। সেলাই করা পোশাক অর্থ এমন পোশাক যা মানুষের শরীরের মাপে অথবা কোনো অঙ্গের মাপে সেলাই করে তৈরি করা হয়েছে, যেমন স্বাভাবিক পরিধানের পোশাক, প্যান্ট-পাজামা, জামা, ইত্যাদি।

৫- সুগন্ধি লাগানো।

৬- ভক্ষণ করা হয় এমন স্থলজ শিকার-জন্তু হত্যা করা বা শিকার করা।

৭- বিবাহ করা।

৮- সহবাস করা। প্রথম তাহাল্লুল হওয়ার আগে (১০ তারিখ মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করার পূর্বে) সহবাস করলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের হজ বাতিল হয়ে যাবে। তাকে বাতিল হওয়া সত্ত্বেও তাকে বুদনা তথা পূর্ণ একটি উট দম হিসেবে দিতে হবে, হজের বাকী কাজ পূর্ণ করতে হবে এবং পরের বছর আবার হজ করতে হবে। আর প্রথম তাহাল্লুল (১০ তারিখ মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করার পরে) সহবাস হলে তার হজ বাতিল হবে না, তবে তাকে ছাগল দম হিসেবে যবাই করতে হবে।

৯- স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যভাবে সহবাস করলে এতে বীর্যপাত হলে বুদনা ওয়াজিব হবে আর বীর্যপাত না হলে ছাগল ওয়াজিব হবে। তবে উভয় অবস্থাতেই হজ বাতিল হবে না।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজের বিধানের ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের মতোই; তবে সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করার ব্যাপারে আলাদা। তারা ইচ্ছামতো সেলাইকৃত জামা-কাপড় পরতে পারবে তবে তা অশ্লীল হতে পারবে না। তারা মাথা ঢেকে রাখবে এবং চেহারা খোলা রাখবে, তবে গাইরে মুহরিম তথা পরপুরুষ থাকলে চেহারাও ঢেকে রাখবে।

হজে তিনটি কাজের যেকোন দু’টি কাজ করলে প্রথম তাহাল্লুল বা প্রাথমিকভাবে নিষেধাজ্ঞামুক্ত হয়ে যায়। সেগুলো হচ্ছে:

১- তাওয়াফ

২- পাথর নিক্ষেপ ও

৩- মাথার চুল মুণ্ডানো বা কাটা।

তামাত্তু হজ পালনকারী মহিলা তাওয়াফের আগে হায়েযগ্রস্ত হলে এবং সে হজের কার্যক্রম ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করলে তখন সে ইহরাম বাঁধবে এবং এতে সে ক্বারিন হজকারী হিসেবে গণ্য হবে। হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত নারীরা তাওয়াফ ব্যতীত হজের সব কাজ করবে, শুধু তাওয়াফটি পবিত্র হলে আদায় করবে।

মুহরিম ব্যক্তির জন্য খাওয়া যোগ্য পশু যেমন, মুরগি ইত্যাদি যবেহ করা বৈধ। হিংস্র ও ক্ষতিকর প্রাণী যেমন, সিংহ, নেকড়ে বাঘ, চিতাবাঘ, সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর ও সব ধরণের ক্ষতিকর প্রাণি হত্যা করা জায়েয। এমনিভাবে তার জন্য সামুদ্রিক প্রাণী শিকার করা ও খাওয়া জায়েয।

মুহরিম ও গাইরে মুহরিম সকলের জন্য মক্কার হারাম এলাকার গাছ কাটা ও আগাছা উপড়ে ফেলা হারাম। তবে ইযখির কাটা যাবে। এমনিভাবে হারাম

এলাকার প্রাণীও হত্যা করা হারাম। কেউ এসব করলে তাকে ফিদিয়া দিতে হবে। মদীনার হারাম সীমানা থেকেও গাছ কাটা হারাম, তবে কেউ গাছ কেটে ফেললে তাকে কিছু ফিদিয়া দিতে হবে না।

কারো উল্লিখিত সহবাস ব্যতীত ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজের কোনো একটি করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে যেমন, মাথার চুল মুণ্ডানো বা সেলাইকৃত পোশাক পরা ইত্যাদি করলে তাকে ফিদিয়া দিতে হবে। সে নিচের যেকোন একটি আদায়ের মাধ্যমে এ ফিদিয়া আদায় করতে পারবে। সেগুলো হলো:

১- তিনদিন সাওম পালন করবে।

২- অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দিবে। প্রত্যেককে এক মুদ গম বা চাল বা এ জাতীয় খাদ্য দান করতে হবে।

৩- অথবা ছাগল যবেহ করতে হবে।

কেউ অজ্ঞতাবশত বা ভুলে বা জোরপূর্বক ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে সে গুনাহগার হবে না এবং তাকে কোনো ফিদিয়াও দিতে হবে না। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]

“হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৬]

কেউ ইহরাম অবস্থায় ইচ্ছাকৃত স্থলজ প্রাণী হত্যা করলে তাকে অনুরূপ প্রাণী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, উক্ত প্রাণী যবাই করে হারামের অধিবাসী মিসকীনদেরকে খাদ্য খাওয়াতে হবে অথবা এর মূল্যে খাদ্য ক্রয় করে তা মিসকীনকে খাওয়াতে হবে, প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ পরিমাণ খাদ্য দিতে হবে। অথবা প্রত্যেক মুদের পরিবর্তে একদিন সাওম পালন করতে হবে। আর হত্যাকৃত প্রাণীর যদি অনুরূপ প্রাণী পাওয়া না যায় তাহলে তাকে উক্ত প্রাণীর মূল্য ধার্য করে সে মূল্য দ্বারা খাদ্য ক্রয় করে তা হারামের অধিবাসী মিসকীনদেরকে খাদ্য খাওয়াতে

হবে। প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ পরিমাণ খাদ্য দিতে হবে। অথবা প্রত্যেক মুদের পরিবর্তে একদিন সাওম পালন করতে হবে।

বীর্যপাত ছাড়া সহবাসের ফিদিয়া উপরোক্ত বিশেষ প্রয়োজনে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার ফিদিয়ার মতোই। অর্থাৎ সাওম পালন বা খাদ্য দান বা ছাগল যবেহ করা।

আর হজে প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞামুক্ত হওয়ার আগে সহবাস করলে বুদনা (উট) ফিদিয়া দিতে হবে। উট যবেহ করতে অক্ষম হলে হজের দিনগুলোতে তিনদিন ও হজের পরে বাড়ি ফিরে বাকী সাত দিন সাওম পালন করতে হবে। আর প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞামুক্ত হওয়ার পরে সহবাস করলে শুধু কষ্টের কারণে করা কাজের ফিদিয়া (অর্থাৎ সাওম পালন বা মিসকীনকে খাদ্য দান বা ছাগল যবেহ করা) দিলেই হবে।

তামাত্তু‘ ও ক্বারিন হজ আদায়কারী মক্কাবাসী না হলে তাদের ওপর হাদী তথা ছাগল বা উটের সাত ভাগের একভাগ বা গরুর সাত ভাগের একভাগ যবেহ করা ওয়াজিব। আর কেউ হাদী যবেহ করতে না পারলে সে হজের দিনগুলোতে তিনদিন ও বাড়ি ফিরে বাকী সাত দিন সাওম পালন করবে।

হজ পালনে বাধাগ্রস্ত ব্যক্তি হাদী যবেহ করতে না পারলে দশ দিন সাওম পালন করে হালাল হবে।

কেউ একই ধরনের নিষিদ্ধ কাজ বারবার সম্মুখীন হলে সে ফিদিয়া আদায় না করে থাকলে একবার ফিদিয়া আদায় করলেই হবে, তবে শিকার করলে তার জন্য আলাদা আলাদা ফিদিয়া দিতে হবে। আর কেউ ভিন্ন ধরণের নিষিদ্ধ কাজ একাধিক বার করলে যেমন, একবার মাথা মুণ্ডন করলো, তারপরে নখ কাটলো তাকে প্রত্যেকটি কাজের জন্য আলাদা আলাদা ফিদিয়া আদায় করতে হবে।

মিকাত

মিকাতের প্রকারভেদ:

মিকাত দু'প্রকার। তাহলো:

১- মিকাত যামানী বা সময়ের মিকাত। তা হলো হজের মাসসমূহ। অর্থাৎ শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ মাস।

২- মিকাতে মাকানী বা স্থানের মিকাত। হজ বা উমরা পালনকারীকে ইহরামের নিয়ত ব্যতীত এ সব স্থান অতিক্রম করা হারাম। এগুলো পাঁচটি:

ক- যুলহুলাইফা: যুলহুলাইফা মদীনাবাসী ও মদীনার দিক থেকে আসা জল, স্থল বা আকাশসীমার হাজীদের মিকাত। এটি মক্কা থেকে ৪৩৫ কি.মি দূরে এবং মক্কা থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী মিকাত।

খ- আল-জুহফা: এটি সিরিয়া, মিসরসহ সে দিক থেকে আসা জল, স্থল বা আকাশসীমার হাজীদের মিকাত। এটি রাবেগ শহরের কাছে অবস্থিত মক্কা থেকে ১৮০ কি.মি দূরে অবস্থিত। বর্তমানে লোকেরা সেটার বদলে রাবেগ শহর থেকে ইহরাম বাঁধে।

গ- ইয়ালামলাম: এটি ইয়েমেন ও ইয়ামেনের দিক থেকে আসা জল, স্থল বা আকাশসীমার হাজীদের মিকাত। এটি মূলতঃ একটি উপত্যকা যা মক্কা থেকে ৯২ কি.মি দূরে অবস্থিত।

ঘ- কারনুল মানাযিল: এটি নাজদ, তায়েফ ও এদিক থেকে দিক থেকে আসা জল, স্থল বা আকাশসীমার হাজীদের মিকাত। বর্তমানে এর নাম 'আস-সাইলুল কাবীর'। মক্কা থেকে ৭৫ কি.মি দূরে অবস্থিত। ওয়াদি মুহাররাম কারনুল মানাযিলের সবচেয়ে উঁচু স্থান।

ঙ- যাতু ইরক: এটি ইরাক, খোরাসান, নজদের মধ্য অঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল ও এর ওপারের দেশবাসীদের দিক থেকে আসা জল, স্থল বা আকাশসীমার হাজীদের মিকাত। এটি একটি উপত্যকা। এটি 'দরীবা' নামে পরিচিত। এটি মক্কা থেকে প্রায় ১০০ কি.মি দূরে অবস্থিত।

এসব মিকাত উপরোক্ত অঞ্চলে বসবাসকারী ও যারা এ দিক থেকে হজ ও উমরা আদায় করার জন্য অতিক্রম করবে তাদের মিকাত।

যাদের বাড়ি উপরোক্ত মিকাতের অভ্যন্তরে মক্কার দিকে, তাদের হজ ও উমরার মিকাত নিজের ঘর থেকে শুরু করতে হবে। তবে যাদের বাড়ি মক্কার মধ্যে তারা হারাম এলাকার বাড়ি থেকে বের হয়ে 'হিল' বা হালাল এলাকায় এসে উমরার নিয়ত করবে। আর হজের জন্য মক্কায় বসেই নিয়ত করবে।

যাদের পথ এসব মিকাতের পথে পড়ে না তারা তাদের মিকাতের সর্বাধিক কাছাকাছি ও সমান সীমায় পৌঁছলে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবে। চাই তারা বিমান বা গাড়ি বা নৌযান যেকোনো পথে আসুক।

ইহরাম ছাড়া এসব মিকাত অতিক্রম করা জায়েয নেই। কেউ ইহরাম ছাড়া এসব স্থান অতিক্রম করলে তাকে সেখানে ফিরে যেতে হবে এবং সেখান থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। আর যদি সেখানে ফিরে যাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে যেখানে আছে সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবে এবং তাকে দম দিতে হবে। তার হজ ও উমরা সহীহ হবে। আর মিকাতের আগে থেকেই ইহরাম বাঁধলে মাকরূহসহ জায়েয হবে।

৭- কুরবানী ও আক্বীকা

কুরবানী

কুরবানী ও আইয়্যামে তাশরীকের (১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ) দিনে কুরবানীর নিয়াতে উট, গরু ও ছাগল যবাই করা। এটি সুন্নাত।

কুরবানী যবেহ করার সময়:

ঈদুল আযহার দিনে ঈদের সালাতের পর থেকে আইয়্যামুত তাশরীক তথা ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ পর্যন্ত কুরবানীর সময়।

- কুরবানীর গোশত তিনভাগ করে বিতরণ করা সুন্নাত। তিনভাগের একভাগ নিজে খাবে, একভাগ আত্মীয়-স্বজনকে হাদিয়া দিবে এবং একভাগ দান করবে।
- কুরবানী করা অনেক ফযীলতপূর্ণ। কেননা এতে নিজের পরিবার পরিজনের জন্য প্রশস্ততা, গরিব মিসকিনের উপকারিতা ও তাদের অভাব পূরণ হয়।
- কুরবানী ও হাদী উটের দ্বারা করলে কমপক্ষে পাঁচ বছর, গরুর দুই বছর বছর, ভেড়ার ছয় মাস ও ছাগলের এক বছর বয়স হতে হবে।
- একটি ছাগল দ্বারা একজন কুরবানী দিতে পারবে। আর উট ও গরু দ্বারা সাতজন কুরবানী দিতে পারবে। তাছাড়া একটি ছাগল বা উট বা গরু দিয়ে নিজের ও পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়া জায়েয। তবে কুরবানীর পশু দোষ-ত্রুটি মুক্ত হতে হবে।

====

আক্বীকা

ভূমিষ্ঠ শিশুর পক্ষ থেকে যে পশু যবাই করা হয় তাই আক্বীকা। আক্বীকা করা সুন্নাত। পুত্র সন্তানের জন্য দু'টি ছাগল এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি ছাগল যবাই করতে হয়। জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীকা করে নাম রাখতে হয় এবং মাথার চুল মুণ্ডানো ও চুলের সমপরিমাণ রৌপ্য দান করতে হয়। সপ্তম দিনে আক্বীকা করতে না পারলে জন্মের চৌদ্দতম দিনে আর সেদিনও না পারলে একুশতম দিনে আক্বীকা করবে। এদিনেও না করলে পরবর্তীতে যখন সম্ভব হয় তখন করে নিবে। আক্বীকার পশুর হাড় না ভাঙ্গা সুন্নাত। আক্বীকা মূলত নতুন সন্তান লাভ ও আগত সন্তান লাভে আল্লাহর নি'আমতের শুকরিয়া আদায়।

====

জিহাদ

ক- জিহাদের পরিচিতি:

কাফিরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে সর্বাত্মক শক্তি ও প্রচেষ্টা ব্যয় করা।

খ- জিহাদ শরী'আতসম্মত হওয়ার হিকমত:

জিহাদ ইসলামের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এবং সর্বোত্তম নফল ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত অনেক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে জিহাদ শরী'আতসম্মত করেছেন:

১- আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করতে এবং দীন পুরোটাই যাতে আল্লাহর জন্য হয়।

২- মানবজাতির সুখ-শান্তি ও তাদেরকে যুলুম-নির্যাতন ও অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে আলোর পথে নিয়ে আসতে।

৩- পৃথিবীতে সত্যকে বাস্তবায়ন করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে, বাতিলকে ধ্বংস করতে এবং যুলুম ও ফাসাদকে চিরতরে নিষেধ করতে।

৪- দীনকে প্রচার-প্রসার, মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা এবং শত্রুর ষড়যন্ত্রের দাতভাঙ্গা জবাব দিতে ইত্যাদি কারণে আল্লাহ জিহাদ শরী'আতসম্মত করেছেন।

গ- জিহাদের হুকুম:

জিহাদ ফরযে কিফায়া। যখন একদল লোক জিহাদ করবে এবং তারা এ কাজে তারা যথেষ্ট হলে অন্যদের থেকে এ হুকুম রহিত হয়ে যাবে। তবে নিম্নোক্ত অবস্থায় জিহাদ সকলের ওপর ফরয হয়ে যায়:

১- যুদ্ধের কাতারে চলে আসলে।

২- কারও দেশ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে।

৩- ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলে।

ঘ- জিহাদ ফযর হওয়ার শর্তাবলী:

ইসলাম, আকেল, বালিগ, পুরুষ, অসুস্থতা ও অক্ষমতা থেকে মুক্ত থাকা এবং জিহাদে যাওয়ার খরচ থাকা।

ঙ- জিহাদের প্রকারভেদ:

জিহাদ চার প্রকার। সেগুলো হচ্ছে:

১- নফসের জিহাদ: নফসের জিহাদ হলো দীন শিক্ষা করে সে অনুযায়ী আমল করে মানুষকে দীনের পথে দাওয়াত দেওয়া এবং এ কাজে কষ্ট-ক্লেশ ও যুলুম নির্যাতন আসলে ধৈর্য ধারণ করা।

২- শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ: শয়তান বান্দাকে যেসব সন্দেহ-সংশয়, মনের প্রবৃত্তি ও ধোকায় ফেলে সেগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

৩- কাফির ও মুনাফিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা: এ যুদ্ধ অন্তর, ভাষা, সম্পদ ও হাতে তথা শক্তির দ্বারা হয়।

৪- যালিম, বিদ‘আতী ও অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে জিহাদ: উত্তম জিহাদ হচ্ছে সক্ষম হলে হাত তথা শক্তির দ্বারা প্রতিহত করা। শক্তির দ্বারা সক্ষম না হলে জিহ্বা তথা মুখের ভাষা দ্বারা প্রতিহত করা এবং এতেও অক্ষম হলে অন্তরের দ্বারা জিহাদ করা।

চ- শহীদের মর্যাদা:

আল্লাহর কাছে শহীদের সাতটি মর্যাদা রয়েছে। তা হলো: তার প্রথম ফোটা রক্ত জমিনে পড়ার সাথে সাথেই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন, সে নিজের অবস্থান জান্নাতে দেখতে পায়, কবরের আযাব থেকে রক্ষা পায়, কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে নিরাপদ থাকে, ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করে, তাকে ডাগর চক্ষু হুর বিবাহ করানো হবে এবং তার আত্মীয়-স্বজন থেকে সত্তরজনকে শাফা‘আত করতে পারবে।

ছ- যুদ্ধের আদবসমূহ:

ইসলামে যুদ্ধের শিষ্টাচারসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো ধোকাবাজি না করা, নারী ও শিশু যুদ্ধে লিপ্ত না হলে তাদেরকে হত্যা না করা, অহমিকা ও প্রতারণা থেকে

দূরে থাকা, শত্রুর সাথে মিলিত হওয়ার আকাঙ্খা না করা, আল্লাহর কাছে বিজয় ও সাহায্যের প্রার্থনা করা। যেমন, এ দো‘আ পড়া,

«اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ»

“হে আল্লাহ আল-কুরআন অবতরণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, শত্রুদলসমূহের পরাভূতকারী, আপনি শত্রুদের পরাভূত করে আমাদেরকে তাদের উপর জয়ী করুন।”[1]

যুদ্ধের ময়দান থেকে দু’অবস্থায় পশ্চাদপসরণ করা যাবে:

প্রথমত: যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করতে।

দ্বিতীয়ত: নিজের দলের সাথে যোগ দিতে।

জ- যুদ্ধবন্দি:

১- নারী ও শিশুকে যুদ্ধদাস বানানো হবে।

২- যোদ্ধাপুরুষকে যুদ্ধের পরিচালক হয়ত মুক্ত করে দিবেন বা মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করবেন বা হত্যা করবেন।

[যোদ্ধাদের প্রতি আমীরের কর্তব্য:]

যুদ্ধে পাঠানোর আগে ইমাম তার সৈন্যবাহিনীকে ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিবেন, নিরাশ, বিপদকালে ধোকাকারী ও গুজব রটনাকারীকে যুদ্ধে যেতে বারণ করবেন, অতিপ্রয়োজন ব্যতিত কাফিরের থেকে সাহায্য চাইবে না, যুদ্ধের রসদ সামগ্রী যোগাড় করে দিবেন, তিনি তার সৈন্যবাহিনীর ধীর-স্থিরভাবে চালাবেন, তাদের জন্য সুন্দর জায়গা নির্বাচন করবেন, সেনাবাহিনীকে ঝগড়া ফাসাদ ও গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিবেন, তাদের মন মানসিকতা চাঙ্গা ও শক্তিশালী হয় এমন কথা বলবেন, তাদেরকে শহীদের মর্যাদার ফযীলত বর্ণনা করে উৎসাহিত করবেন, ধৈর্যের আদেশ দিবেন,

---

[1] সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াসসাইর, হাদীস নং ২৯৬৬; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, হাদীস নং ১৭৪২।

সৈন্যবাহিনীকে কয়েকটি দলে ভাগ করবেন, তাদের জন্য মনিটর ও পাহারাদার নিযুক্ত করবেন, শত্রুর খোঁজ খবর নিতে গুপ্তচর পাঠাবেন, সৈন্যদের প্রয়োজন অনুসারে যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে আনফাল তথা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ বণ্টন করবেন এবং জিহাদের বিষয়ে দীন সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকদের সাথে পরামর্শ করবেন।

আমিরের প্রতি সেনাবাহিনীর দায়িত্ব ও কর্তব্য:

সৈন্যবাহিনীর ওপর ফরয হলো ইমাম তথা আমিরের আনুগত্য করা, তার সাথে ধৈর্যসহকারে থাকা, আমিরের অনুমতি ব্যতিত যুদ্ধ না করা; তবে হঠাৎ করে শত্রু আক্রমণ করলে তাদের দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা করলে সেক্ষেত্রে যুদ্ধ শুরু করা যাবে, শত্রুরা সন্ধি করতে চাইলে বা তারা হারাম মাসে থাকলে মুসলিমগণের উচিৎ তাদের সাথে চুক্তি করা।

দ্বিতীয় অধ্যয়: মু‘আমালাত তথা লেনদেন

- বেচাকেনা এর বিধিবিধান ও শর্তাবলী।
- রিবা তথা সুদ জাতি ও গোষ্ঠীর অর্থনীতির ধ্বংসের হাতিয়ার এবং রিবার বিধান।
- ইজারা, এর বিধান ও শর্তাবলী।
- ওয়াকফ, এর বিধান ও শর্তাবলী।
- ওয়াসিয়্যাহ তথা অসিয়ত, এর বিধান ও শর্তাবলী।

====

দ্বিতীয় অধ্যয়: মু‘আমালাত তথা লেনদেন

১- বাই‘ তথা বেচাকেনা

ক- বাই‘ তথা বেচাকেনার পরিচিতি:

বাই‘ (البيع) শব্দটি (باع) এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ মালের বিনিময় মাল নেওয়া বা বিনিময় পরিশোধ করে তার বিনিময়ে বস্তু গ্রহণ করা।

পারিভাষিক অর্থে বেচাকেনা হলো, এমন আর্থিক লেনদেন যা নির্দিষ্ট বস্তু বা কোনো উপকারের স্থায়ী মালিকানা সাব্যস্ত করে। যা কোনো নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয় না।

বাই‘ তথা বেচাকেনার হুকুম:

বাই‘ তথা বেচাকেনা জায়েয হিসেবে শরী‘আতসম্মত। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে এটা জায়েয হওয়া প্রমাণিত।

খ- বাই‘ তথা বেচাকেনা জায়েয হওয়ার হিকমত:

যেহেতু অর্থ, পণ্য ও বস্তু বিভিন্ন মানুষের কাছে ছড়িয়ে আছে। একজন মানুষ অন্যের কাছে যা আছে তার প্রতি মুখাপেক্ষী। আবার উক্ত ব্যক্তি যেহেতু বিনিময় পরিশোধ ছাড়া অন্যকে বস্তুটি দিবে না সেহেতু বেচাকেনা জায়েয করা হয়েছে। বেচাকেনা বৈধ হওয়ার দ্বারা মানুষ তার অভাব পূরণ করতে সক্ষম হয় এবং তার প্রয়োজনীয় জিনিস লাভ করতে পারে। এজন্যই আল্লাহ মানুষের এসব প্রয়োজন মিটাতে বেচাকেনা হালাল করেছেন।

বাই‘ তথা বেচাকেনার রুকনসমূহ:

বেচাকেনার রুকন হলো:

১- সিগাহ তথা বেচাকেনার শব্দ: ইজাব তথা বেচাকেনার প্রস্তাব ও কবুল তথা প্রস্তাবনা গ্রহণ করা।

২- ক্রেতা ও বিক্রেতা।

৩- বেচাকেনার বস্তু ও দাম।

সিগাহ তথা বেচাকেনার শব্দ:

ক্রেতা ও বিক্রেতার একজনের বেচাকেনার প্রস্তাব ও অন্যজনের গ্রহণ করার শব্দ বা যেসব শব্দ বেচাকেনার ওপর উভয়ের সন্তুষ্টি বুঝায় তাই বেচাকেনার শব্দ। যেমন বিক্রেতা বলল, আমি এ জিনিসটি এমন কিছুর বিনিময়ে আপনার কাছে বিক্রি করলাম বা আপনাকে দিলাম বা আপনাকে মালিক বানালাম ইত্যাদি। আর ক্রেতা তথা খরিদদার বলল, আমি জিনিসটি ক্রয় করলাম বা মালিক হলাম বা ক্রয় করলাম বা গ্রহণ করলাম বা এ জাতীয় কোনো শব্দ বলা।

কর্মবাচক ক্রিয়া দ্বারা বেচাকেনা বিশুদ্ধ হবে, চাই তা ক্রেতা-বিক্রেতা যে কোনো একই ব্যক্তির পক্ষ থেকে হোক কিংবা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের পক্ষ থেকেই হোক।

টেলিফোনে বেচাকেনা:

টেলিফোনে কথা বলা বেচাকেনার বৈঠক হিসেবে ধর্তব্য। ফোনে কথা শেষ হওয়া মানে এ বৈঠক সমাপ্ত হওয়া। কেননা 'উরফ তথা প্রচলিতভাবে ফোনে কথা শেষ মানে উভয়ের বেচাকেনা শেষ বলেই ফয়সালা করা হয়।

বেচাকেনা শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী:

বেচাকেনা শুদ্ধ হওয়ার শর্ত সাতটি। সেগুলো হচ্ছে:

১- ক্রেতা ও বিক্রেতা বা তাদের স্থলাভিষিক্ত উভয়ের সন্তুষ্ট।

২- ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের বেচাকেনা জায়েয হওয়া অর্থাৎ উভয়ে স্বাধীন, মুকাল্লাফ তথা শরী'আতের বিধানের উপযোগী হওয়া এবং জ্ঞানবান হওয়া।

৩- বিক্রয়ের জিনিসটির ব্যবহার বৈধ হওয়া। অতএব সেসব জিনিস বেচা-কেনা করা জায়েয নেই যেসব জিনিস ব্যবহারে কোনো উপকার নেই (অর্থাৎ বেহুদা জিনিস) বা যেসব জিনিস ব্যবহার করা হারাম, যেমন: মদ, শূকর ইত্যাদি অথবা

যাতে এমন উপকার রয়েছে যা কেবল নিরুপায় হলেই ব্যবহার করা যায় যেমন মৃতপ্রাণি।

৪- বেচাকেনার সময় বিক্রিত জিনিস বিক্রেতা বা তার পক্ষ থেকে বিক্রির জন্য অনুমোদিত ব্যক্তির মালিকানায় থাকা।

৫- বিক্রিত জিনিসটি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা, তার গুণাগুণ জানা ও দেখার মাধ্যমে।

৬- বিক্রয়ের জিনিসের দাম নির্দিষ্ট থাকা।

৭- বিক্রয়ের জিনিসটি হস্তান্তরযোগ্য হওয়া। অতএব, পলাতক বা হাওয়ায় উড়ন্ত কোনো কিছু ইত্যাদি বেচাকেনা করা শুদ্ধ হবে না।

বেচাকেনার মধ্যে শর্ত প্রদানের বিধান:

বেচাকেনার মধ্যে শর্তাবলী দুভাগে বিভক্ত। প্রথম প্রকার সহীহ শর্ত, যাতে বেচাকেনা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যায়, আর দ্বিতীয় প্রকার ফাসিদ শর্ত, যাতে বেচাকেনা চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। বেচাকেনার মধ্যে সহীহ শর্ত যেমন, মূল্য পুরোটাই বা সুনির্দিষ্ট অংশ বাকী রাখা বা সুনির্দিষ্ট বস্তু বন্ধক রাখা বা সুনির্দিষ্ট বস্তু গ্যারান্টি হিসেবে রাখা। কেননা এসব শর্ত বেচাকেনার সুবিধার্থেই করা হয়। অথবা বিক্রিত জিনিসের ক্ষেত্রে কোনো গুণাগুণ থাকা শর্ত করা। কারণ হাদীসে এসেছে,

«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»

“মুসলিমের উচিৎ সন্ধির শর্তের উপর স্থির থাকা।”।[1]

অনুরূপভাবে ক্রেতা তার বিক্রিত জিনিসের ওপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিক্রেতার কাছে উপকারের শর্তারোপ করা সহীহ। যেমন, বসতঘরে একমাস থাকার শর্তারোপ করা।

---

[1] আবু দাউদ, আকদিয়্যাহ, হাদীস নং ৩৫৯৪।

আর ফাসিদ শর্ত, তা দু'প্রকার। তন্মধ্যে কিছু ফাসিদ শর্ত আছে যা মূল বেচাকেনাকেই বাতিল করে দেয়। যেমন, এক বেচাকেনার ওপর আরেকটি বেচাকেনার শর্ত জুড়ে দেওয়া, উদাহরণত: ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে অগ্রিম হাওলাত দেওয়ার শর্ত কিংবা অন্য কিছু বিক্রি করার শর্ত, অথবা ইজারা দেওয়ার শর্ত অথবা ঋণ দেওয়ার শর্ত জুড়ে দেওয়া।

আবার কিছু শর্ত আছে যাতে বেচাকেনা বাতিল হয় না তবে শর্ত বাতিল হয়ে যায়। যেমন, কারও পক্ষ থেকে এমন শর্ত দেওয়া যে, বিক্রিত জিনিসের কোনো লোকসান তার ওপর বর্তাবে না বা ক্রয়-বিক্রয়ের জিনিস চালু রাখবে নতুবা সে তা ফেরত দিবে। অথবা জিনিসটিকে ক্রেতা বিক্রি করতে পারবে না বা দান করতে পারবে না। তবে এসব শর্ত যদি কোনো নির্দিষ্ট স্বার্থ সংরক্ষণ করে তখন সে শর্ত দেওয়া শুদ্ধ হবে।

নিষিদ্ধ বেচাকেনা:

যেসব জিনিস কল্যাণকর ও বরকতময় সেসব জিনিসে ইসলাম বেচাকেনা বৈধ করেছে। যেসব বেচাকেনার মধ্যে অস্পষ্টতা বা অজ্ঞতা বা ধোকা বা মানুষের জন্য ক্ষতিকর বা কারো ওপর আক্রমণের আশঙ্কা থাকে ইত্যাদি যা মানুষের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া ও মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় সেসব বেচাকেনা ইসলাম হারাম করেছে। এসব বেচাকেনার মধ্যে অন্যতম:

১- আল-মুলামাসা: (ছোয়া-স্পর্শের বেচাকেনা)

যেমন কেউ কাউকে বলল, আপনি যে কাপড়টিই স্পর্শ করবেন তা এত টাকার বিনিময়ে আপনার। এ ধরনের বেচা-কেনা ফাসিদ। কেননা এতে অজ্ঞতা ও ধোকা রয়েছে।

২- বাই'য়ুল মুনাবাযা: (নিক্ষেপ-ছোঁড়ার বেচা-কেনা)

যেমন, এভাবে বলা, যে কাপড়টি আপনি আমার দিকে ছুঁড়ে মারবেন তা এত টাকার বিনিময়ে আপনার। এ ধরণের বেচা-কেনাও ফাসিদ। কেননা এতে অজ্ঞতা ও ধোকা রয়েছে।

৩- বাই'য়ুল হুসাত: (ঢিল ছোঁড়ার বেচাকেনা)

যেমন কেউ এভাবে বলা, আপনি এ কঙ্করটি নিক্ষেপ করুন, তা যে জিনিসটির ওপর পরবে তা এত টাকার বিনিময়ে আপনার। এ ধরণের বেচাকেনাও ফাসিদ। কেননা এতে অজ্ঞতা ও ধোকা রয়েছে।

৪- বাই'য়ুন নাজশ: (দালালীর বেচাকেনা)

কেউ মূল্য বৃদ্ধির জন্য অন্যকে শোনানোতে কোনো জিনিসের দাম বলা অথচ সে জিনিসটি কিনবে না। এ ধরণের বেচাকেনা হারাম। কেননা এতে ক্রেতাকে ধোকা দেওয়া হয় এবং তাকে প্রতারিত করা হয়।

৫- বাই'আতাইন ফী বাই'আহ (এক বেচাকেনায় দু'টি বেচাকেনা থাকা)

যেমন কেউ বলল, আমি আপনার কাছে এ জিনিসটি বিক্রয় করলাম এ শর্তে যে আপনি আমার কাছ ঐ জিনিসটি বিক্রি করবেন বা আপনি আমার কাছ থেকে এ জিনিসটি ক্রয় করবেন। অথবা এভাবে বলা, এ জিনিসটি আপনার কাছে নগদ দশ টাকায় বা বাকীতে বিশ টাকায় বিক্রি করলাম এবং দু'টির একটি নির্দিষ্ট না করেই দুজনে আলাদা হয়ে যাওয়া। এ ধরণের বেচাকেনা সহীহ নয়; কেননা এ ধরণের বেচাকেনায় প্রথম অবস্থায় বিক্রিটি শর্তের সাথে ঝুলে থাকে, আর দ্বিতীয় অবস্থায় বেচাকেনার মূল্য স্থির হয় নি।

৬- শহরের লোক গ্রামের কারও বিক্রেতা হওয়া:

অর্থাৎ গ্রামের কেউ শহরে পণ্য নিয়ে আসার আগেই তার থেকে কম মূল্যে ক্রয় করে বেশি মূল্যে বিক্রি করা: দৈনিক বাজারদরের চেয়ে বেশি মূল্যে দালালদের বেচাকেনা।

৭- একজনের বেচাকেনার ওপর আরেকজনের বেচাকেনা:

যেমন কেউ একটি জিনিস দশ টাকায় ক্রয় করতে চাইলে তাকে বলা যে, এটি আমার থেকে নয় টাকায় ক্রয় করতে পারবে।

৮- কোনো বস্তু হস্তগত করার আগেই তা আবার বিক্রি করা।

৯- বাই'য়ুল 'ঈনাহ:

যেমন কোনো বস্তু নির্দিষ্ট মেয়াদে বিক্রি করে অতঃপর তার থেকে নগদে অল্প দামে ক্রয় করা।

১০- জুমু'আর সালাতের দ্বিতীয় আযান হলে যাদের ওপর জুমু'আর সালাত আদায় করা ফরয তাদের বেচাকেনা।

২- রিবা তথা সুদ-এর বিধান, প্রকারভেদ সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থায় ইসলামের পদ্ধতিসমূহ

ক. রিবা তথা সুদের পরিচিতি:

الربا শব্দটি সাধারণত অতিরিক্ত ও বৃদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, বলা হয়, ربا المال إذا زاد ونما সম্পদ যখন বৃদ্ধি পায় ও বাড়ে। আবার বলা হয়, أربى على الخمسين زاد পঞ্চাশের বেশি বেড়েছে। তবে সাধারণত সব ধরণের হারাম বেচাকেনাকে রিবা বা সুদ বলা হয়।

ফিকহবিদদের পরিভাষায়:

الزيادة في أشياء مخصوصة.

“নির্দিষ্ট কিছু জিনিসের মধ্যে অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে রিবা বলা হয়”।

অথবা

هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.

“তা এমন এক বিশেষ বিনিময় চুক্তি; যা সংঘটিত হওয়ার সময় শরী‘আতের মাপকাঠি অনুযায়ী সমতা বিধান করা হয় নি। অথবা তা এমন এক বিশেষ বিনিময় চুক্তি; যাতে উভয় জিনিস বাকীতে বা একটি জিনিস বাকীতে বিনিময় করা হয়েছে”।

খ. সুদ হারাম হওয়ার তাৎপর্য:

নিম্নোক্ত অনেক কারণে ইসলাম সুদকে হারাম করেছে:

১- প্রচেষ্টা ও ফলাফলের মধ্যে সামঞ্জস্যতা না থাকা। কেননা সুদ বিনিয়োগকারী যা অর্জন করে ও লাভ করে তা কোনো প্রকার প্রচেষ্টা, পরিশ্রম ও কাজ না করেই পেয়ে থাকে এবং সে ব্যবসায় ক্ষতির ভাগও বহন করে না।

২- সুদ গ্রহীতারা কর্ম বিমুখ হওয়ার কারণে সমাজে অর্থনীতি ধ্বংস হওয়া এবং তারা অতিরিক্ত লাভের প্রত্যাশায় নিজেরা আরাম আয়েশ ও অলসতায় জীবন যাপন করবে এবং ঋণ গ্রহীতাদের ওপর আরো ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিবে।

৩- মানুষের মধ্যে সাহায্য সহযোগিতা না থাকার কারণে সমাজে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী নিঃশেষ হয়ে যাবে। যা সমাজে আত্মত্যাগ, ভালোবাসা ও অন্যকে প্রধান্য দেওয়ার পরিবর্তে সমাজকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে, মানুষের মাঝে আমিত্ব তথা অহংকার ও হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিবে।

৪- সমাজকে উঁচু-নিচু দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করে দিবে। এক শ্রেণি হবে তাদের সম্পদের দ্বারা সুবিধাভোগী ও নির্যাতনকারী শাসকগোষ্ঠি; অন্যদিকে আরেক শ্রেণি হবে নিতান্ত গরীব-মিসকীন ও দুর্বল, যাদের পরিশ্রম ও কষ্ট অন্যায়ভাবে অন্যরা ভোগ করবে।

গ. রিবা বা সুদের প্রকারভেদ:

আলেমদের কাছে রিবা বা সুদ দু'ধরণের। তা হলো:

১- রিবা নাসীয়া: 'নাসীয়া' শব্দের অর্থ বাকী ও বিলম্বের সুদ। সুদসহ ঋণ ফেরত দিতে বিলম্বের বিনিময়ে ঋণ ও ঋণের সুদের ওপর অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ করা। একে সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সুদ (রিবা বিল-আজাল) বলা হয়।

২- রিবা ফদল: শাব্দিক অর্থে ফদল (অতিরিক্ত) শব্দটি নকস (কমতি) এর বিপরীত।

পারিভাষিক অর্থে, একই জাতীয় দু'টি জিনিসের মধ্যে একটির বিনিময়ে অতিরিক্ত নেওয়া। যেমন, স্বর্ণের পরিবর্তে সমপরিমাণ স্বর্ণ না নিয়ে অতিরিক্ত স্বর্ণ গ্রহণ করা, এমনিভাবে গমের পরিবর্তে অতিরিক্ত গম নেওয়া ইত্যাদি যেসব জিনিসে প্রচলিতভাবে সুদ হয়ে থাকে। একে বেচাকেনার সাথে সংশ্লিষ্ট সুদ (রিবা আল-বাই') বা গোপন সুদ (রিবা আল-খফী) ও বলা হয়।

- শাফে‘ঈ মাযহাবের লোকেরা তৃতীয় আরেক প্রকারের সুদের কথা বলেছেন, তা হলো ‘হস্তগত করার সাথে সংশ্লিষ্ট সুদ’ (রিবা আল-ইয়াদ)। অর্থাৎ মূল্য ও বস্তু অথবা দু’টির যেকোনো একটি নগদ গ্রহণ না করে বিলম্বে গ্রহণ করা।
- কেউ কেউ চতুর্থ আরেক প্রকারের সুদের কথা বলেছেন, তা হলো ঋণ সম্পৃক্ত সুদ (রিবা আল-কারদ্ব)। আর তা হলো, বেচাকেনার মধ্যে কোনো উপকারের শর্তারোপ করা।
- তবে এসব (তৃতীয় ও চতুর্থ) প্রকার সুদ প্রকৃতপক্ষে আলেমদের বর্ণিত উপরোক্ত প্রকারভেদের বাইরে নয়। কেননা তারা যাকে ‘হস্তগত করার সাথে সংশ্লিষ্ট সুদ’ (রিবা আল-ইয়াদ) বা ‘ঋণ সম্পৃক্ত সুদ’ (রিবা আল-কারদ্ব) বলা হয়েছে তা উপরোক্ত দু’প্রকারের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব।
- আধুনিক অর্থনীতিবিদরা সুদকে ‘ক্ষয়িষ্ণু সুদ’ (ইসতিহলাকি) ও ‘উৎপাদনশীল বর্ধিষ্ণু সুদ’ (ইনতাজি) এই দু’ভাগে ভাগ করেছেন।

১- ‘ক্ষয়িষ্ণু সুদ’ (ইসতিহলাকি) হচ্ছে, খাদ্য-দ্রব্য ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় ধ্বংসশীল খাদ্য-দ্রব্য ও ঔষধপত্র ইত্যাদি ক্রয় করতে নেওয়া ঋণের ওপর প্রদত্ত অতিরিক্ত সুদ।

২- ‘উৎপাদনশীল বর্ধিষ্ণু সুদ’ (ইনতাজি) হচ্ছে: উৎপাদন কাজে ঋণের ওপর নেওয়া অতিরিক্ত সুদ। যেমন, ফ্যাক্টরি বানানো বা চাষাবাদ বা ব্যবসায়িক কাজে ঋণ নেওয়া।

- অর্থনীতিবিদরা সুদকে আরও দু’প্রকারে ভাগ করেছেন। তা হলো:

১- দ্বিগুণ সুদ (মুদ্বা‘আফ): যে লেনদেনে সুদের পরিমাণ অনেক বেশি।

২- সামান্য সুদ (বাসীত): যে লেনদেনে সুদের পরিমাণ অনেক কম থাকে।

ইসলাম সব ধরণের সুদের কারবার হারাম করেছে, চাই তা রিবাল ফদল বা রিবা নাসীয়া হোক, এতে সুদের পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক, ক্ষয়প্রাপ্ত খাদ্য-দ্রব্যে হোক বা উৎপদনশীল কাজে নিয়োজিত হোক। উপরোক্ত সব

প্রকারের সুদ আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতে হারামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

“অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫]

ঘ. সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনে ইসলামের পদ্ধতিসমূহ:

সুদের লেনদের থেকে পরিত্রাণ পেতে ইসলাম বিকল্প কিছু পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। সেগুলো নিম্নরূপ:

১- ইসলাম মুদারাবা লেনদেন বৈধ করেছে: ইসলাম সুদবিহীন অর্থ ব্যবস্থা প্রচলনে মুদারাবা তথা অংশীদারিত্ব ব্যবসা জায়েয করেছে। এতে একজনের মূলধন থাকবে এবং অন্যজন ব্যবসায়ে কাজ করবে। আর এভাবে অর্জিত লভ্যাংশ উভয়ের মধ্যকার চুক্তি অনুসারে পাবে। তবে ব্যবসায়ে ক্ষতি হলে মূলধন বিনিয়োগকারীর ওপর বর্তাবে। আর শ্রমদাতার ওপর ক্ষতির ভাগ বর্তাবে না, যেহেতু তার কষ্ট ও শ্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই সে অর্থের ক্ষতির অংশীদার হবে না।

২- ইসলাম বাই‘য়ে সালাম তথা মূল্য নগদ পরিশোধ আর বস্তু বাকীতে বেচাকেনা বৈধ করেছে: অর্থাৎ কারো নগদ অর্থের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে সে উক্ত জিনিসের উৎপাদনের সময় আসার আগে উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করে এবং ফিকহশাস্ত্রে বর্ণিত শর্তানুযায়ী বেচাকেনা করা বৈধ।

৩- ইসলাম বাকীতে বেচাকেনা বৈধ করেছে: নগদ বিক্রি মূল্যের চেয়ে বাকীতে বেশি মূল্যে বিক্রি করা জায়েয। মানুষের সুবিধার্থে এবং সুদের লেনদেন থেকে মুক্ত হতে ইসলাম এ বেচাকেনা বৈধ করেছে।

৪- ইসলাম কর্যে হাসানা তথা বিনা লাভে ঋণ প্রদানের জন্য নানা ধরনের সংস্থা হওয়াকে উৎসাহিত করেছে। ব্যক্তি বা সমষ্টি বা সরকারী বা বেসরকারী

যেকোনো ধরণের সংস্থাকে এ ঋণের জন্য ইসলাম উৎসাহিত করেছে; যাতে উম্মাতের মধ্যে পরস্পর সামাজিক সহযোগিতা ও দায়ভার বাস্তবায়িত হয়।

৫- ইসলাম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে, অভাবী ফকীরকে, বিপদগ্রস্ত পথিক প্রভৃতি অভাবী মানুষের প্রয়োজন মিটাতে, তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে যাকাতের বিধান প্রচলন করেছে।

সমাজে ব্যক্তির প্রয়োজন মিটাতে ও মানুষের সম্মান সংরক্ষণে ইসলাম উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহ খুলে দিয়েছে। এভাবে তার অভাব মিটাতে সে সুউচ্চ উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়, তার প্রয়োজনের সুরক্ষা হয়, কর্ম ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

ব্যাংকের লাভ ও এর হুকুম:

ফায়েদা অর্থ লাভ, বহুবচনে ফাওয়ায়েদ। অর্থনীতিবিদদের মতে ব্যাংকের ফায়েদা বা লাভ মানে নগদ অর্থ। বস্তুত: ব্যাংক ও সমবায়ী বাক্সগুলো আমানত বা জমার অর্থ রাখার বিনিময়ে যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে বা ঋণ নিলে তার ওপর যে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করে, তাই ব্যংকের দৃষ্টিতে লাভ হিসেবে তারা বর্ণনা করে থাকে।

এটা মূলত রিবা বা সুদ। বরং এটিই আসল সুদ, যদিও ব্যাংক একে লাভ বলে থাকে। নিঃসন্দেহে এ ধরণের লাভ কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা কর্তৃক হারাম সুদের অন্তর্ভুক্ত।

ঋণের বিনিময়ে উল্লিখিত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ হারাম হওয়া সম্পর্কে আলেমদের ইজমা বর্ণিত আছে। তারা যেটাকে কর্জ বা ঋণ বলে থাকে তা আসলে সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম রহ.-এর মতে ঋণ নয়। কেননা কর্জের উদ্দেশ্য হলো ইহসান, হৃদ্যতা ও সহযোগিতা করা। অথচ এ ধরণের লেনদেন প্রকৃতপক্ষে নির্দিষ্ট মেয়াদে টাকার বেচাকেনা করা ও শর্তের ভিত্তিকে নির্দিষ্ট মেয়াদে লাভ করা। অতএব, বুঝা গেল ব্যাংক কর্জের বিনিময়ে বা

জমাকৃত অর্থের বিনিময়ে যে অতিরিক্ত লাভ দেওয়া ও নেওয়া করে তাকে পুরোপুরি সুদই বলে। সুদ ও ব্যাংকের লাভ একটি অপরটির নাম মাত্র।

৩- ইজারা তথা ভাড়া

ক- ইজারা তথা ভাড়ার পরিচিতি:

নির্দিষ্ট মেয়াদে দু'জনের মধ্যে বৈধ উপকারের বিনিময় চুক্তি করা।

খ- ইজারার হুকুম:

ইজারা জায়েয। এটা দুপক্ষের মাঝে অত্যাবশ্যকীয় চুক্তি।

গ- ইজারা শরী'আতসম্মত হওয়ার হিকমত:

ইজারা মূলত মানুষের মাঝে পরস্পর সুবিধা বিনিময়। শ্রমিকদের কাজের প্রয়োজন, থাকার জন্য ঘরের দরকার, মালামাল বহন, মানুষের আরোহণ ও সুবিধার জন্য পশু, গাড়ি ও যন্ত্রের দরকার। আর ইজারা তথা ভাড়ায় খাটানো বৈধ হওয়ায় মানুষের জন্য অনেক কিছু সহজ হয়েছে ও তারা তাদের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হচ্ছে।

ঘ- ইজারার প্রকার:

ইজারা দু'প্রকার। তা হচ্ছে:

১- নির্দিষ্ট জিনিস ও আসবাবপত্র ভাড়া দেওয়া। যেমন, কেউ বলল, আমি আপনাকে এ ঘর বা গাড়িটি ভাড়া দিলাম।

২- কাজের ওপর ভাড়া দেওয়া। যেমন, কেউ দেয়াল নির্মাণ বা জমি চাষাবাদ ইত্যাদি করতে কোনো শ্রমিককে ভাড়া করল।

ঙ- ইজারার শর্তাবলী:

ইজারার শর্ত চারটি। তা হলো:

১- লেনদেনটি জায়েয হওয়া।

২- উপকারটি নির্দিষ্ট হওয়া। যেমন, ঘরে থাকা বা মানুষের খিদমত বা ইলম শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি।

৩- ভাড়া নির্ধারণ করা।

৪- উপকারটি বৈধ হওয়া। যেমন ঘরটি বসবাসের জন্য হওয়া। অতএব, কোনো হারাম উপকার সাধনে যেমন, যিনা, গান বাজনা, ঘরটি গীর্যার জন্য ভাড়া দেওয়া বা মদ বিক্রির জন্য ব্যবহার করা ইত্যাদি হারাম কাজের সুবিধার জন্য ভাড়া দেওয়া বৈধ নয়।

মাসআলা:

কেউ বিনা চুক্তিতে গাড়ি, বিমান, ট্রেন ও নৌকা ইত্যাদিতে আরোহণ করলে বা দর্জিকে কাপড় কাটতে বা সেলাই করতে দিলে বা কুলিকে দিয়ে বোঝা বহন করালে তার এসব কাজ জায়েয হবে এবং তাকে সেখানকার 'উরফ তথা প্রচলিত নিয়মানুসারে ভাড়া প্রদান করতে হবে। কেননা 'উরফ তথা প্রচলিত প্রথা এসব ব্যাপারে ও এ জাতীয় আরো অন্যান্য ব্যাপারে কথা বলে চুক্তি করার মতোই।

চ- ভাড়াকৃত জিনিসের শর্তাবলী:

ভাড়াকৃত নির্দিষ্ট জিনিসের মধ্যে শর্ত হচ্ছে সেটি ভালো করে দেখা ও এর গুণাবলী জানা, এর প্রদত্ত উপকারের ব্যাপারে চুক্তি করা, এর অংশের ওপর চুক্তি নয়, সেটা সমর্পন করতে সমর্থ হওয়া, বাস্তবেই তাতে উপকার থাকা এবং ভাড়াকৃত জিনিসটি ভাড়া প্রদানকারীর মালিকানাধীন থাকা বা তার ভাড়া দেওয়ার অনুমতি থাকা।

ছ- ইজারার আরো কিছু মাসয়ালা:

- ওয়াকফকৃত জিনিসের ভাড়া দেওয়া জায়েয। ভাড়া প্রদানকারী মারা গেলে চুক্তিটি বাতিল না হয়ে পরবর্তী যিনি ওয়াকফের রক্ষণাবেক্ষণে আসবেন তার কাছে চুক্তিটি থাকবে এবং তিনি বাকী ভাড়া গ্রহণ করবেন।
- যেসব জিনিস বেচাকেনা হারাম সেসব জিনিস ভাড়া দেওয়াও হারাম, তবে ওয়াকফ, স্বাধীন ব্যক্তিকে আযাদ ও উম্মে ওয়ালাদ তথা মালিকের কাছে যে দাসীর বাচ্চা হয়েছে এসব বাদে। কেননা এসব জিনিসে ভাড়া জায়েয।

- ভাড়াকৃত জিনিসটি নষ্ট হয়ে গেলে এবং উপকার সাধন শেষ হয়ে গেলে ইজারা বাতিল হয়ে যাবে।
- শিক্ষাদান, মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদি কাজের বিনিময়ে ভাড়া (পারিশ্রমিক) নেওয়া জায়েয। আর হজের বিনিময়ে প্রয়োজন হলে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয।
- ইমাম, মুয়াযযিন বা কুরআন শিক্ষাদানকারী বাইতুল মাল থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে অথবা নিঃশর্তভাবে তাদেরকে প্রদান করা হলে তাদের জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ।
- ভাড়াগ্রহণকারী অবহেলা ও সীমালঙ্ঘন না করলে ভাড়াকৃত জিনিস তার কাছে নষ্ট হলে এর কোনো জরিমানা দিতে হবে না।
- চুক্তি করার দ্বারা ভাড়া দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়, ভাড়াকৃত জিনিস ফেরত দেওয়ার সময় ভাড়াও জমা দেওয়া ওয়াজিব, তবে দুজনে বিলম্বে বা কিস্তিতে প্রদানে রাজি থাকলে তাও জায়েয। আর শ্রমিক তার কাজ শেষ করলে সে তার পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে।

৪- ওয়াকফ

১- ওয়াকফের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচিতি:

ওয়াকফের শাব্দিক অর্থ:

الوقف (ওয়াকফ) শব্দটি وقف এর মাসদার। এর বহুবচন أوقاف যেমন বলা হয়, (وقف الشيء وأوقفه وحبسه وأحبسه وسبّله) কোনো কিছু ওয়াকফ করা, আটকে রাখা, উৎসর্গ করা। সবগুলোই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আর পারিভাষিক অর্থে, বস্তুর মূল স্বত্ব ধরে রেখে (মালিকানায় রেখে) এর উপকারিতা ও সুবিধা প্রদান করা।

২- ওয়াকফ শরী'আতসম্মত হওয়ার মূল দলীল:

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও উম্মতের ইজমার দ্বারা ওয়াকফ শরী'আতসম্মত হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হলো, সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীস,

«أن عمر قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ».

"(উমার ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি এ জমির ব্যাপারে পরামর্শের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন) এবং বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি খায়বারে এমন উৎকৃষ্ট কিছু জমি লাভ করেছি যা ইতোপূর্বে আর কখনো পাই নি। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে কী আদেশ দেন? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি ইচ্ছা করলে জমির মূল স্বত্ত্ব ওয়াককে আবদ্ধ করতে এবং উৎপন্ন বস্তু সাদকা করতে পার।" বর্ণনাকারী ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, উমার ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ শর্তে তা

সদকা (ওয়াকফ) করেন যে, তা বিক্রি করা যাবে না, তা দান করা যাবে না এবং কেউ এর উত্তরাধীকারী হবে না”।[1]

ফলে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর উৎপন্ন বস্তু অভাবগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজন, দাসমুক্তি, আল্লাহর রাস্তায়, মুসাফির ও মেহমানদের জন্য সদকা করে দেন। বর্ণনাকারী আরও বলেন, যিনি এর মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য সম্পদ সঞ্চয় না করে যথাবিহীত খাওয়া কোনো দোষের বিষয় নয়।

ওয়াকফ শুধু মুসলিমদের বৈশিষ্ট্য। জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের যাদেরই সামর্থ ছিলো তারা সকলেই ওয়াকফ করেছেন।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় যে, বর্তমানে মানুষ যা করে তা আসলে সাহাবীগণের কাজের বিপরীত। কেননা বর্তমানে মানুষ সাধারণত অসিয়ত করে থাকেন, ওয়াকফ করেন না।

৩- ওয়াকফ শরী‘আতসম্মত হওয়ার হিকমত:

১- আল্লাহ যাদেরকে ধন-সম্পদ দিয়ে প্রশস্ত করেছেন তাদের কল্যাণকর ও তাঁর আনুগত্যের কাজে কিছু দান করতে তিনি উৎসাহিত করেছেন যাতে তাদের সম্পদ তাদের মৃত্যুর পরেও এর মূলস্বত্ব অবশিষ্ট থেকেও এর ফায়েদা মানুষ ভোগ করতে পারে এবং তার জীবন শেষ হলেও এর সাওয়াব উক্ত ব্যক্তি পেতে পারে। হতে পারে তার মৃত্যুর পরে তার ওয়ারিশরা তার সম্পদ যথাযথ হিফাযত করবে না, ফলে তার আমল শেষ হয়ে যাবে এবং এতে তার পরিণাম দুর্দশাগ্রস্ত হবে। এসব সম্ভাবনা দূরীকরণে এবং কল্যাণকর কাজে অংশীদার

---

[1] সহীহ বুখারী, শুরুত, হাদীস নং ২৫৮৬; সহীহ মুসলিম, অসিয়্যাহ, হাদীস নং ১৬৩৩; তিরমিযী, আহকাম, হাদীস নং ১৩৭৫; নাসাঈ, আহবাস, হাদীস নং ৩৬০৪; আবু দাউদ, ওয়াসাইয়া, হাদীস নং ২৮৭৮; ইবন মাজাহ, আহকাম, হাদীস নং ২৩৯৬; মুসনাদ আহমদ, ২/৫৫।

হতে ইসলাম মানুষের জীবদ্দশায় ওয়াকফ করার পদ্ধতি শরী‘আতসম্মত করেছে। যাতে ওয়াকফকারী নিজে মরে যাওয়ার পরেও এসব ভালো কাজে সম্পৃক্ত থাকতে পারে, ফলে তিনি জীবদ্দশায় যেভাবে দান করতে চাইতেন মরনের পরেও সেভাবে সাওয়াব পাবেন।

২- মসজিদ, মাদ্রাসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কল্যাণকর কাজ এবং এসবের দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণের মূল হলো ওয়াকফ করা। যুগে যুগে যেসব মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার অধিকাংশ ওয়াকফের দ্বারাই হয়েছে। এমনকি মসজিদে ব্যবহৃত আসবাবপত্র, বিছানা, কার্পেট, পরিস্কার পরিচ্ছন্নের জিনিসপত্র ও মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত ব্যক্তিদের যাবতীয় খরচ এসব ওয়াকফের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

৪- ওয়াকফের শব্দাবলী:

ওয়াকফের স্পষ্ট কিছু শব্দ আছে, তা হলো:

(وقفت) আমি ওয়াকফ করলাম বা (حبست) আমি এর মূল মালিকানা আটকে ওয়াকফ রাখলাম বা (سبّلت) আমি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করলাম।

আর ওয়াকফের অস্পষ্ট ও ঈঙ্গিতপূর্ণ শব্দ হলো:

(تصدقت) আমি দান করলাম বা (حرّمت) আমি এটি আমার জন্য হারাম করলাম বা (أبدت) আমি মানুষের জন্য সারাজীবনের জন্য দান করলাম।

তবে অস্পষ্ট ও ঈঙ্গিতপূর্ণ শব্দে ওয়াকফ করলে নিচের তিনটি জিনিসের যে কোনো একটি পাওয়া যেতে হবে।

১- ওয়াকফের নিয়ত করা। কেউ এসব শব্দ বলে ওয়াকফের নিয়ত করলে ওয়াকফ হয়ে যাবে।

২- এসব অস্পষ্ট ও ঈঙ্গিতপূর্ণ শব্দ বলার সাথে স্পষ্ট শব্দ পাওয়া গেলে বা অন্য ঈঙ্গিতপূর্ণ শব্দ পাওয়া যায় তাহলেও ওয়াকফ হবে। যেমন, এভাবে বলা,

تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبّسة أو مسبّلة أو مؤبدة أو محرمة.

“আমি এটি ওয়াকফ হিসেবে দান করলাম বা মূলস্বত্ব রেখে ওয়াকফ হিসেবে দান করলাম বা উৎসর্গ করলাম বা সারাজীবনের জন্য দান করলাম বা এটি আমার জন্য হারাম”।

৩- ওয়াকফের বস্তুটি নিম্নোক্ত শব্দাবলী দ্বারা বর্ণনা করা। যেমন, বলা

محرمة لا تباع ولا توهب.

ওয়াকফের বস্তুটি আমার জন্য হারাম, তা বিক্রি করা যাবে না, তা দান করা যাবে না।

শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে যেমন ওয়াকফ করা যায় তেমনি ব্যক্তির কাজের দ্বারাও ওয়াকফ করা যায়। যেমন কেউ নিজের জমিতে মসজিদ নির্মাণ করল এবং লোকজনকে তাতে সালাত আদায় করতে অনুমতি দিলো।

৫- ওয়াকফের প্রকারভেদ:

প্রথম থেকে ওয়াকফটি কাদের জন্য করা হয়েছে সে হিসেবে ওয়াকফ দু’প্রকার।

১- খাইরী তথা কল্যাণকর কাজে ওয়াকফ।

২- আহলী তথা পরিবার পরিজনের জন্য ওয়াকফ।

১- খাইরী তথা কল্যাণকর কাজে ওয়াকফ:

ওয়াকফকারী শুরু থেকেই জনকল্যাণকর কাজে বস্তুটি ওয়াকফ করল; যদিও তা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য। এরপরে ওয়াকফটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য হবে। যেমন কেউ হাসপাতাল বা মাদ্রাসার জন্য জমি ওয়াকফ করল। অতঃপর পরবর্তীতে তা তার সন্তানদের জন্য হবে।

২- আহলী তথা পরিবার পরিজনের জন্য ওয়াকফ:

শুরুতে নিজের বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের নামে ওয়াকফ হবে। পরবর্তীতে তা জনকল্যাণ কাজে ওয়াকফ হবে। যেমন কেউ তার নিজের নামে ওয়াকফ

করল, অতঃপর তা তার সন্তানদের হবে, অতঃপর তা জনকল্যাণ কাজে ওয়াকফ হবে।

৬- যেসব জিনিস ওয়াকফ করা যায়:

ওয়াকফের স্থান তথা যেসব জিনিস ওয়াকফ করা যায় তা হলো মূল্যবান স্থাবর সম্পত্তি যা ব্যক্তির মালিকানায় বর্তমান রয়েছে। যেমন, জমি, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি অথবা স্থানান্তরযোগ্য জিনিস। যেমন, বই, কাপড়, অস্ত্র ইত্যাদি। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

“আর খালিদ ইবন ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, তার ওপর তোমরা অবিচার করছ। কেননা সে তার বর্ম এবং অন্যান্য সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিয়েছে।”[1]

আলেমগণ একমত যে, মসজিদে মাদুর ও মোমবাতি ওয়াকফ করা নিন্দনীয় নয়।

পরিধানের জন্য গহনা ওয়াকফ করা ও ধার দেওয়া জায়েয। কেননা এগুলো উপকারী জিনিস। সুতরাং জায়গা জমির মতো এগুলোও ওয়াকফ করা যাবে।

৭- ওয়াকফকারীর শর্তসমূহ:

ওয়াকফকারীর মধ্যে কতিপয় শর্ত থাকতে হবে, নতুবা তার ওয়াকফ করা জায়েয হবে না। শর্তগুলো হচ্ছে:

১- ওয়াকফকারী দান করার যোগ্য হতে হবে। অতএব, জবরদখলকারী ও যার মালিকানা এখনও স্থির হয় নি এমন লোকদের পক্ষ থেকে ওয়াকফ করা জায়েয হবে না।

---

[1] সহীহ বুখারী, যাকাত, হাদীস নং ১৩৯৯; সহীহ মুসলিম, যাকাত, হাদীস নং ৯৮৩; তিরমিযী, মানাকিব, হাদীস নং ৩৭৬১; নাসাঈ, যাকাত, হাদীস নং ২৪৬৪; আবু দাউদ, যাকাত, হাদীস নং ১৬২৩; মুসনাদ আহমদ, ২/৩২৩।

২- ওয়াকফকারী বিবেকবান (জ্ঞানসম্পন্ন) হতে হবে। অতএব, পাগল ও বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির ওয়াকফ শুদ্ধ হবে না।

৩- বালিগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। অতএব, শিশুর ওয়াকফ শুদ্ধ হবে না, চাই সে ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী হোক বা না হোক।

৪- বুদ্ধিমান হওয়া। অতএব, নির্বোধ বা দেউলিয়া বা অসচেতন লোক যাদের ওপর আইনি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তাদের ওয়াকফ শুদ্ধ হবে না।

৮- ওয়াকফকৃত জিনিসের শর্তাবলী:

ওয়াকফকৃত জিনিসটির মধ্যে যাতে ওয়াকফ বাস্তবায়ন করা যায় সেজন্য ওয়াকফকৃত জিনিসের মধ্যে কিছু শর্ত রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে:

১- ওয়াকফকৃত জিনিসটির মূল্য থাকতে হবে। যেমন, জায়গা জমি ইত্যাদি।

২- ওয়াকফকৃত জিনিসটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞাত থাকা।

৩- ওয়াকফকৃত বস্তুটি ওয়াকফের সময় ওয়াকফকারীর মালিকানায় থাকা।

৪- ওয়াকফকৃত বস্তুটি সুনির্দিষ্ট হবে, এজমালী সম্পত্তি হবে না। অতএব, বহু মানুষের মালিকানাধীন কোনো বস্তুর একাংশ ওয়াকফ করা শুদ্ধ হবে না।

৫- ওয়াকফকৃত জিনিসটিতে অন্যের অধিকার সম্পৃক্ত না থাকা।

৬- ওয়াকফকৃত বস্তুটি দ্বারা ‘উরফ তথা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী উপকার গ্রহণ সক্ষম হওয়া।

৭- ওয়াকফকৃত জিনিসটিতে বৈধ উপকার থাকা।

৯- ওয়াকফকৃত বস্তু থেকে উপকার সাধনের পদ্ধতি:

নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ওয়াকফকৃত বস্তু থেকে উপকার অর্জন করা যায়:

ঘর-বাড়িতে বসবাস করে, আরোহণকারী পশু ও যানবাহনে আরোহণ করে, জীবজন্তুর পশম, দুধ, ডিম, লোম সংগ্রহ করে উপকার নেওয়া যায়।

১০- ওয়াকফ ও অসিয়তের মধ্যে পার্থক্য:

১- ওয়াকফ হলো মূলস্বত্ব নিজের রেখে বস্তুটির উপকার দান করা, অন্যদিকে অসিয়ত হলো দানের মাধ্যমে মৃত্যুর পরে বস্তুগত বা অবস্তুগত (উপকার) জিনিসের মালিক বানানো।

২- অধিকাংশ আলেমদের মতে, ওয়াকফ করলে তা বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে এবং ওয়াকফ ফেরত নেওয়া যায় না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলেছেন,

: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا».

“তুমি ইচ্ছা করলে জমির মূল স্বত্ব ওয়াকফে আবদ্ধ রেখে উৎপন্ন বস্তু সদকা করতে পার।”[1]

অন্যদিকে অসিয়ত করলে বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যকীয় হলেও অসিয়তকারী তার অসিয়তের পুরোটাই বা আংশিক ফেরত নিতে পারবে।

৩- ওয়াকফকৃত বস্তুটি কারো মালিকানায় প্রবেশ করা থেকে বেরিয়ে যাবে, শুধু বস্তুটির উপকার যাদের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে তাদের জন্য নির্ধারিত হবে। পক্ষান্তরে, অসিয়াতের বস্তুটি যাদের জন্য অসিয়ত করা হয়েছে তাদের মালিকানায় যাবে বা এর উপকার অসিয়তকৃতদের জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে।

৪- ওয়াকফের উপকারের মালিকানা যাদের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে তারা ওয়াকফকারীর জীবদ্দশায়ই পাবে এবং তার মৃত্যুর পরেও ভোগ করবে। কিন্তু অসিয়তের মালিকানা অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর ছাড়া ভোগ করতে পারবে না।

---

[1] সহীহ বুখারী, শুরুত, হাদীস নং ২৫৮৬; সহীহ মুসলিম, অসিয়্যাহ, হাদীস নং ১৬৩৩; তিরমিযী, আহকাম, হাদীস নং ১৩৭৫; নাসাঈ, আহবাস, হাদীস নং ৩৬০৪; আবু দাউদ, ওয়াসাইয়া, হাদীস নং ২৮৭৮; ইবন মাজাহ, আহকাম, হাদীস নং ২৩৯৬; মুসনাদ আহমদ, ২/৫৫।

৫- ওয়াকফের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট নয়; পক্ষান্তরে অসিয়তের সর্বোচ্চ সীমা শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত। আর তা হলো মোট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ। তবে ওয়ারিশের অনুমতি সাপেক্ষে এর বেশিও করা যায়।

৬- ওয়ারিশের জন্য ওয়াকফ করা জায়েয, কিন্তু ওয়ারিশের অনুমতি ব্যতীত ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা জায়েয নেই।

৫- অসিয়ত

ক- অসিয়তের পরিচিতি:

অসিয়ত হলো কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পরে কোনো কিছু করা বা হওয়ার নির্দেশনা প্রদান। আমানত পৌঁছে দেওয়া, সম্পদ দান করা, কন্যা বিয়ে দেওয়া, মৃতব্যক্তিকে গোসল দেওয়া, তার জানাযা পড়ানো, মৃতব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ বন্টন করা ইত্যাদি অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত।

খ- অসিয়ত শরী'আতসম্মত হওয়ার মূলভিত্তি:

কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার দ্বারা অসিয়ত শরী'আতসম্মত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨٠]

"তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হবে, যদি সে কোনো সম্পদ রেখে যায়, তবে তা অসিয়ত করবে।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮০]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».

"কোনো মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, তার অসিয়তযোগ্য কিছু রয়েছে আর সে দু'রাত কাটাবে অথচ তার কাছে তার অসিয়ত লিখিত থাকবে না।"[1]

গ- যেসব শব্দ দ্বারা অসিয়ত কার্যকর হবে:

১- মুখে বলার দ্বারা।

২- লেখার দ্বারা।

[1] সহীহ বুখারী, অসাইয়া, হাদীস নং ২৫৮৭; সহীহ মুসলিম, অসিয়ত, হাদীস নং ১৬২৭; তিরমিযী, জানায়েয, হাদীস নং ৯৭৪; নাসাঈ, অসাইয়া, হাদীস নং ৩৬১৬; আবু দাউদ, অসাইয়া, হাদীস নং ২৮৬২; ইবন মাজাহ, অসাইয়া, হাদীস নং ২৬৯৯; মুসনাদ আহমদ, ২/৮০; মুয়াত্তা মালিক, আকদিয়া, হাদীস নং ১৪৯২।

৩- স্পষ্ট বুঝা যায় এমন ইশারার দ্বারা।

প্রথমত: মুখে বলার দ্বারা:

আলেমদের মধ্যে মুখে স্পষ্ট বলার দ্বারা অসিয়ত কার্যকর হওয়াতে কোনো মতভেদ নেই। যেমন কেউ বলল, আমি অমুককে এ অসিয়ত করলাম। অথবা মুখে স্পষ্ট শব্দে না বলে এমন অস্পষ্ট শব্দে বলা যাতে ঈঙ্গিত বহন করে যে তিনি এ শব্দ দ্বারা অসিয়ত করেছেন। যেমন, কেউ কাউকে বলল,

“আমি আমার মৃত্যুর পরে অমুককে এটার মালিক বানালাম অথবা তোমরা সাক্ষ্য থাকো আমি অমুককে এ জিনিসের অসিয়ত করলাম ইত্যাদি”।

দ্বিতীয়ত: লিখিতভাবে অসিয়ত করা:

কেউ কথা বলতে অক্ষম হলে যেমন বোবা বা জিহ্বায় সমস্যা থাকলে তখন তার আক্বল (জ্ঞান) থাকলে এবং কথা উচ্চারণের সম্ভাবনা আর না থাকলে সে লিখিতভাবে অসিয়ত করলে তা কার্যকর হবে।

তৃতীয়ত: বুঝার মতো ইশারা দ্বারা:

বোবা বা জিহ্বায় সমস্যা থাকলে সে ব্যক্তি ইশারায় অসিয়ত করলে তার অসিয়ত কার্যকর হবে, তবে শর্ত হলো যার জিহ্বায় সমস্যা আছে তার চিরতরে কথা বলার সম্ভাবনা না থাকা।

ঘ- অসিয়তের হুকুম:

অসিয়ত করা শরী‘আতসম্মত ও এটি শরী‘আতির আদিষ্ট বিষয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَـٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ﴾ [المائدة: ١٠٦]

“হে মুমিনগণ, যখন তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন অসিয়তকালে তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে দু’জন (ন্যায়পরায়ণ) ব্যক্তি সাক্ষী হবে।” [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ১০৬]

ঙ- অসিয়তের প্রকারভেদ:

১- ওয়াজিব অসিয়ত।

যার ওপর ঋণ, অন্যের হক, আমানত ও অঙ্গিকার রয়েছে তাকে এসব কিছু স্পষ্টভাবে লিখিত রাখা ওয়াজিব যাতে নগদ ও বাকী সব দেনা-পাওয়ানা নির্দিষ্ট করা থাকে। যার কাছে অন্যের আমানত ও অঙ্গিকার রয়েছে তা এমনভাবে স্পষ্ট থাকা যাতে অসিয়তকৃত ব্যক্তি ওয়ারিশদের সাথে স্পষ্টভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

২- সুন্নাত অসিয়ত:

এ ধরণের অসিয়ত করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। অসিয়তকারী তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ ওয়ারিশ ব্যতীত অন্যদের জন্য অসিয়ত করবে। এ ধরণের কল্যাণকর ও জনহিতকর কাজে অসিয়ত করা মুস্তাহাব, চাই তা আত্মীয়-স্বজন বা অনাত্মীয় বা নির্দিষ্ট স্থান যেমন অমুক মসজিদ বা অনির্দিষ্ট স্থান যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, লাইব্রেরী, আশ্রয়কেন্দ্র, হাসপাতাল ইত্যাদি যাই হোক।

চ- অসিয়তের পরিমাণ:

মোট সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করা জায়েয নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'আদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলেছেন,

«أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لاَ» ، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ، قَالَ: «لاَ» ، قُلْتُ: الثُّلُثُ، قَالَ: «فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».

"হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি কি আমার সমুদয় মালের অসিয়ত করে যাব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে অর্ধেক? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে এক তৃতীয়াংশ। তিনি বললেন, আর এক তৃতীয়াংশও অনেক।"[1]

---

[1] সহীহ বুখারী, অসাইয়া, হাদীস নং ২৫৯১; সহীহ মুসলিম, অসিয়ত, হাদীস নং ১৬২৮;

ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা জায়েয নেই, এমনিভাবে ওয়ারিশ ছাড়া অন্যদের জন্য ওয়ারিশের অনুমতি ব্যতীত এক তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত করাও জায়েয নেই।

ছ- যেসব কাজে অসিয়ত শুদ্ধ হবে:

১- ন্যায়-সঙ্গতভাবে অসিয়ত করতে হবে।

২- আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে যেভাবে অসিয়ত শরী'আতসম্মত করেছেন অসিয়ত সেভাবে হতে হবে।

৩- অসিয়তকারী তার কাজে একনিষ্ঠ থাকতে হবে এবং অসিয়তের দ্বারা ভালো ও কল্যাণকর কাজের নিয়ত করবে।

জ- অসিয়তকারীর শর্তাবলী:

১- অসিয়তকারী দান করার যোগ্য হতে হবে।

২- সে অসিয়তকৃত বস্তুর মালিক হতে হবে।

৩- সে খুশী মনে ও স্বেচ্ছায় অসিয়ত করতে হবে।

ঝ- অসিয়তকৃত ব্যক্তি বা সংস্থার শর্তাবলী:

১- অসিয়তটি কল্যাণ ও বৈধ স্থানে হতে হবে।

২- অসিয়ত করার সময় যার জন্য অসিয়ত করবে তার বাস্তবে বা উহ্যভাবে অস্তিত্ব থাকতে হবে। অতএব, অস্তিত্বহীন কিছুর জন্য অসিয়ত করা শুদ্ধ নয়। কেবল জানা ব্যক্তি বা সংস্থার জন্যই অসিয়ত শুদ্ধ হবে।

৩- অসিয়তকৃত ব্যক্তি নির্দিষ্ট হওয়া।

৪- অসিয়তকৃত ব্যক্তি মালিকানার যোগ্য হওয়া বা মালিকানার অধিকারী হওয়া।

৫- অসিয়তকৃত ব্যক্তি অসিয়তকারীর হত্যাকারী না হওয়া।

তিরমিযী, অসাইয়া, হাদীস নং ২১১৬; নাসাঈ, অসাইয়া, হাদীস নং ৩৬২৮; আবু দাউদ, অসাইয়া, হাদীস নং ২৮৬৪; মুসনাদ আহমদ, ১/১৬৮; মুয়াত্তা মালিক, আকদিয়া, হাদীস নং ১৪৯৫; দারেমী, অসাইয়া, হাদীস নং ৩১৯৬।

৬- অসিয়তকৃত ব্যক্তি অসিয়তকারীর ওয়ারিশ না হওয়া।

ঞ- অসিয়তকৃত বস্তুর শর্তাবলী:

১- অসিয়তকৃত বস্তুটি ওয়ারিশ হওয়ার যোগ্য সম্পদ হওয়া।

২- অসিয়তকৃত বস্তুটি শরী'আতের মাপকাঠিতে মূল্যমান সম্পদ হওয়া।

৩- সম্পদটি মালিকানা হওয়ার যোগ্য হওয়া, যদিও অসিয়ত করার সময় তার অস্তিত্ব না থাকে।

৪- অসিয়তকৃত বস্তুটি অসিয়ত করার সময় অসিয়তকারীর মালিকানায় থাকা।

৫- অসিয়তকৃত বস্তুটি শর'ঈ গুনাহ বা হারাম বস্তু না হওয়া।

ট- যেভাবে অসিয়ত সাব্যস্ত হবে:

সর্বসম্মতভাবে লিখিত আকারে অসিয়ত করা মুস্তাহাব। অসিয়তের শুরুতে বিসমিল্লাহ, আল্লাহর সানা ও হামদ লিখবে। অতঃপর, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত ও সালাম জানাবে। অতঃপর বিসমিল্লাহ, আল্লাহর হামদ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত ও সালামের পরে লিখিত আকারে বা মৌখিকভাবে অসিয়তের সাক্ষ্যদ্বয়ের নাম ঘোষণা করবে।

ঠ- অসিয়তের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি:

১- শাসকের পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

২- বিচারকের পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

৩- মুসলিমের পক্ষ থেকে নির্বাচিত কোনো ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

ড- অসিয়ত ভঙ্গের কারণসমূহ:

১- স্পষ্ট বা ইশারায় অসিয়ত ফেরত নেওয়া।

২- শর্তযুক্ত অসিয়তে শর্ত পাওয়া না গেলে।

৩- অসিয়তের জন্য ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি না থাকলে।

৪- অসিয়তকারী অসিয়ত করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেললে।

৫- অসিয়তকারী মুরতাদ হয়ে গেলে কতিপয় আলেমের মতে অসিয়ত ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৬- অসিয়তকৃত ব্যক্তি অসিয়ত ফেরত দিলে।

৭- অসিয়তকারীর আগে অসিয়তকৃত ব্যক্তি মারা গেলে।

৮- অসিয়তকৃত ব্যক্তি অসিয়তকারীকে হত্যা করলে।

৯- অসিয়তকৃত বস্তুটি ধ্বংস হয়ে গেলে বা তাতে অন্যের মালিকানা প্রকাশ পেলে।

১০- ওয়ারিশদের অনুমতি ব্যতীত কোনো ওয়ারিশকে অসিয়ত করলে অসিয়ত ভঙ্গ হয়ে যাবে।

তৃতীয় অধ্যায়: পরিবার সম্পর্কিত

বিবাহ, এর বিধান ও শর্তাবলী

তৃতীয় অধ্যায়: পরিবার সম্পর্কিত

বিবাহ

বিবাহ শরী'আতসম্মত হওয়ার হিকমত:

বিবাহ ইসলামের একটি অন্যতম সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন,

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».

"হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করার সামর্থ রাখে, তারা যেন বিবাহ করে। কেননা, বিবাহ তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং যৌনতাকে সংযমী করে। আর যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সাওম পালন করে; কেননা, সাওম তার যৌনতাকে দমন করবে।"[1] (একদল বর্ণনাকারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

বিবাহের হিকমতের মধ্যে:

১- পারিবারিক সম্পর্ক বজায়, পরস্পর ভালোবাসা বিনিময়, আত্মসংযম ও হারাম কাজ থেকে নিজেকে হিফাযত করতে বিবাহ একটি উত্তম মাধ্যম ও উপায়।

২- (হালালভাবে) বংশ পরিক্রমা ঠিক রেখে সন্তান জন্ম দেওয়া ও বংশ বিস্তারে বিবাহ একটি উত্তম পদ্ধতি।

৩- নানা রোগ-ব্যাধিমুক্ত ও নিরাপদে মানুষের যৌন চাহিদা মিটাতে ও মনোবাসনা পূরণ করতে বিবাহ একটি সুন্দরতম পদ্ধতি।

---

[1] সহীহ বুখারী, নিকাহ, হাদীস নং ৪৭৭৮; সহীহ মুসলিম, নিকাহ, হাদীস নং ১৪০০; তিরমিযী, নিকাহ, হাদীস নং ১০৮১ ; নাসাঈ, সাওম, হাদীস নং ২২৪০ ; আবু দাউদ, নিকাহ, হাদীস নং ২০৪৬ ; ইবন মাজাহ, নিকাহ, হাদীস নং ১৮৪৫ ; আহমদ, ১/৩৭৮ ; দারেমী, নিকাহ, হাদীস নং ২১৬৫।

৪- বিবাহের মাধ্যমে সন্তান লাভের দ্বারা পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের স্বাদ ভোগ করা যায়।

৫- বিবাহে রয়েছে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য শান্তির আবাস, প্রশান্তি, শালীনতা ও সচ্চরিত্র।

বিবাহের শাব্দিক ও পারিভাষিক পরিচিতি:

বিবাহের শাব্দিক সংজ্ঞা:

নিকাহ তথা বিবাহের শাব্দিক অর্থ যৌন সঙ্গম, দু'টি জিনিস একত্রিত করা। কখনও কখনও নিকাহ বন্ধন বা চুক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, (نكح فلانة) যখন কেউ বিয়ে করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে ও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আবার বলা হয়, (نكح امرأته) সে তার স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম করল।

শরী'আতের পরিভাষায় বিবাহ:

عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع أو الازدواج أو المشاركة.

"নিকাহ হলো এমন একটি চুক্তি যাতে 'বিবাহ দেওয়া বা বিবাহ করা' ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে উপভোগ বা একত্রে থাকা বা পরস্পর অংশীদার হওয়া বুঝায়"।

বিবাহের হুকুম:

যাদের যৌন চাহিদা রয়েছে তবে যিনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা নেই তাদের জন্য বিয়ে করা সুন্নাত। আর যাদের যিনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাদের জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব। যাদের যৌন চাহিদা নেই যেমন, পুরুষত্বহীন ও বয়স্ক ইত্যাদি লোকের বিয়ে করা বৈধ। তবে প্রয়োজন না থাকলে যারা দারুল হরবে তথা যুদ্ধরত কাফির রাষ্ট্রে অবস্থান করেন তাদের জন্য বিয়ে করা হারাম।

বিবাহ সংঘটিত হওয়ার শব্দাবলী:

যে কোনো ভাষায় বিবাহ করা বা দেওয়া বুঝায় এমন সব শব্দে বিবাহ সংঘটিত হবে। যেমন বলা, (زوجت أو نكحت) আমি বিবাহ করলাম বা বিয়ে দিলাম। অথবা বলা, (قبلت هذا النكاح) আমি এ বিয়ে কবুল করলাম। অথবা (تزوجتها) আমি তাকে বিয়ে করলাম, বা (تزوجت) আমি বিয়ে করলাম, অথবা (رضيت) এ বিয়ে আমি রাজি আছি।

আরবী ভাষার শব্দ ব্যবহার করা মুস্তাহাব। তবে যারা আরবী ভাষা জানেন না তারা তাদের ভাষায় প্রস্তাবনা ও কবুল করলেই বিয়ে সংঘটিত হবে।

বিবাহের রুকনসমূহ:

বিয়ের রুকন দু'টি। তা হলো:

১- প্রস্তাব (الإيجاب): অলী তথা অভিভাবক অথবা যিনি তার স্থলাভিষিক্ত হবেন তার পক্ষ থেকে বিয়ে করার বা বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া। যিনি আরবী ভালো পারেন তার (إنكاح أو تزويج) শব্দ দ্বারা প্রস্তাব দেওয়া উত্তম। কেননা এ শব্দদ্বয় কুরআনে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء : ٣]

"তাহলে তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩]

২- কবুল (القبول): স্বামী বা তার স্থলাভিষিক্ত থেকে বিয়ে কবুল করার শব্দ। যেমন বলা, (قبلت) আমি বিয়ে কবুল করলাম বা (رضيت هذا النكاح) এ বিয়ে আমি রাজি আছি বা শুধু কবুল করেছি বলা। ইজাব তথা প্রস্তাব কবুলের আগে হতে হবে, তবে কোনো আলামত থাকলে আগে কবুল বললেও হবে।

বিবাহের শর্তাবলী:

বিয়ের শর্ত চারটি। তা হচ্ছে:

১- স্বামী-স্ত্রী নির্ধারিত হওয়া।

২- স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি থাকা। অতএব, স্বামী-স্ত্রী কাউকে জোর করে বিয়ে

দেওয়া জায়েয নেই। কুমারী ও অকুমারী উভয়ের অনুমতি নিবে। কুমারীর চুপ থাকা তার অনুমতি দেওয়া আর অকুমারীর মৌখিক সম্মতি নিতে হবে। পাগল ও নির্বোধের ক্ষেত্রে এটি শর্ত নয়।

৩- অভিভাবক: অভিভাবক পুরুষ, স্বাধীন, বালিগ (প্রাপ্তবয়স্ক), আকেল (জ্ঞানবান), বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। এছাড়া একই দীনের অনুসারী হওয়াও শর্ত। বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের বাবা তার অভিভাবক হওয়ার সর্বাধিক যোগ্য, অতঃপর বাবার অসিয়তকৃত ব্যক্তি, অতঃপর তার দাদা, এভাবে উর্ধতন দাদারা, অতঃপর তার ছেলে ও নিম্নতম ছেলেরা, তার সহোদর ভাই, অতঃপর তার বৈমাত্রেয় ভাই, অতঃপর এসব ভাইয়ের ছেলেরা, অতঃপর, আপন চাচা, অতঃপর বৈমাত্রেয় চাচা, অতঃপর তাদের সন্তানেরা, অতঃপর বংশীয় নিকটাত্মীয়রা, অতঃপর দেশের বাদশাহ অভিভাবক হবেন।

৪- সাক্ষ্য: ন্যায়পরায়ণ, পুরুষ ও শরী'আতের বিধান প্রযোজ্য (প্রাপ্তবয়স্ক) এমন দুজন সাক্ষ্যের সাক্ষী ছাড়া বিয়ে শুদ্ধ হবে না।

৫- স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বিবাহ বন্ধনে শরী'আতের নিষেধাজ্ঞামুক্ত থাকা (অর্থাৎ যাদের সাথে বিয়ে হারাম তাদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া)।

বিবাহে যেসব কাজ সুন্নাত ও যেসব কাজ হারাম:

- যে ব্যক্তি দীনদারিতা, ভিনদেশীয়তা, কুমারী, সন্তান ও সৌন্দর্য্যের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণতা ও সমতা বজায় রাখতে পারবে না তার জন্য একটি বিয়ে করা সুন্নাত।
- বিয়ের খিতবা তথা প্রস্তাব দেওয়া কন্যাকে সতর ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভালোভাবে দেখা মুস্তাহাব, যাতে তাকে বিয়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলে, তবে নির্জনে দেখতে পারবে না। এমনিভাবে কনেও হবু বরকে ভালোভাবে দেখা মুস্তাহাব।
- বিয়ের প্রস্তাবকারী বরের পক্ষে মেয়েকে দেখা সম্ভব না হলে সে একজন

বিশ্বস্ত নারী পাঠাবে, তিনি ভালোভাবে দেখে তাকে মেয়ের গুণাবলী বর্ণনা করবে।

- কেউ কোনো মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিলে উক্ত প্রস্তাবকারী তার প্রস্তাব ফিরিয়ে নেওয়া বা তাকে দেখার অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত অন্য কেউ উক্ত মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হারাম।
- যেসব নারী তিন ত্বালাক ব্যতীত বায়েন ত্বালাকের ইদ্দত পালনরত তাদেরকে স্পষ্ট বা ইশারায় বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া বৈধ।
- তবে রাজ'ঈ তালাকের ইদ্দত পালনকারী নারীকে স্পষ্ট বা ইশারায় বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হারাম।
- জুম'আর দিন (শুক্রবার) বিকেলে বিয়ে পড়ানো সুন্নাত। কেননা আসরের সালাতের পরের সময় দো'আ কবুল হয় এবং সম্ভব হলে মসজিদে বিয়ে পড়ানো সুন্নাত।

====

চতুর্থ অধ্যয়: মুসলিম নারী সম্পর্কিত কতিপয় বিধি-বিধান

ভূমিকা:

শরী‘আতের বিধান প্রযোজ্যদের (মুকাল্লাফ) হিসেবে শরী‘আত প্রণেতার (আল্লাহ ও তার রাসূল) বিধি-বিধান তিন প্রকার। সেগুলো হলো:

১- শুধু পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য।

২- শুধু নারীদের জন্য প্রযোজ্য।

৩- নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য।

এ অধ্যয়ে শুধু নারীদের জন্য প্রযোজ্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা (বিধান) আলোচনা করব । আর নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য অধিকাংশ বিধি-বিধান ইতোপূর্বে উল্লিখিত তিনপ্রকারে আলোচনা করা হয়েছে।

নারীদের জন্য প্রযোজ্য বিধানগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

নারী সম্পর্কিত বিধি-বিধান

প্রথম মাসআলা:

বারুকার উপর মাসাহ করার হুকুম: প্রয়োজনে বারুকা পড়া জায়েয। কোনো নারীর মাথায় বারুকা পড়ার প্রয়োজন হলে সে তা পড়তে পরবে; কিন্তু সালাতের জন্য অযু করার সময় তাতে মাসাহ করবে না। কেননা এটি খিমার তথা ঘোমটা নয় এবং ঘোমটার অর্থেও নয়। তাকে সরাসরি আল্লাহর সৃষ্ট মাথা বা মাথার চুল মাসাহ করতে হবে।

দ্বিতীয় মাসআলা:

নখ পালিশ: কিছু মহিলা ইচ্ছাকৃত নখ ও শরীরে পালিশ করেন যা তাদের চামড়ায় পানি পৌঁছতে বাঁধা দেয়। এ ধরণের কাজ করা না জায়েয। বরং পবিত্রতা অর্জনের শর্ত হলো অযুর সময় পানি অযুর অঙ্গে পৌঁছা।

তৃতীয় মাসআলা:

হায়েয: মহিলাদের যৌনাঙ্গ থেকে সুস্থ অবস্থায় প্রসব বা কুমারীত্বে নষ্ট হওয়ার

কারণ ছাড়াই যে রক্ত বের হয় তা হলো হায়েয।

অনেক আলেমের মতে, মেয়েদের নয় বছর বয়স থেকে হায়েযের সময় শুরু হয়। এ বয়সের আগে কারো রক্ত দেখা দিলে তা হায়েযের রক্ত নয়; বরং তা কোনো রোগের কারণে হতে পারে। মেয়েদের মৃত্যু পর্যন্ত হায়েয চলতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পঞ্চাশ বছর পর হায়েয শেষ হয়ে যায়।

হায়েযের রক্ত ছয় ধরণের। তা হলো, কালো, লালচে, হলুদ, কর্দমাক্ত, নীল ও ধূসর বর্ণের।

হায়েযের সর্বনিম্ন সময় একদিন ও একরাত। মধ্যম সময়সীমা হলো পাঁচ দিন আর সর্বোচ্চ সময়সীমা পনেরো দিন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েদের ছয় বা সাত দিন পর্যন্ত হায়েয হয়ে থাকে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দু'হায়েযের মধ্যবর্তী পবিত্ররতার সর্বনিম্ন সময়সীমা তেরো দিন। তবে এর বেশি বা কমও হতে পারে।

হায়েয অবস্থায় সালাত, সাওম, মসজিদে প্রবেশ, কুরআন খুলে তিলাওয়াত করা, কা'বা তাওয়াফ করা ও সহবাস করা ইত্যাদি নিষেধ। এছাড়াও হায়েয প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার নিদর্শন।

চতুর্থ মাসআলা:

নিফাস: প্রসব বা অকাল প্রসবের (যদি গর্ভপাতে বাচ্চার অবয়ব স্পষ্ট হয়) কারণে স্ত্রীলিঙ্গ থেকে প্রবাহিত রক্তকে নিফাস বলে।

নিফাসের সময়সীমা: সাধারণত সর্বোচ্চ সময়সীমা চল্লিশ দিন, তবে এর নিম্ন সময়সীমা নেই। কেউ যমজ সন্তান প্রসব করলে প্রথম সন্তানের জন্মদিন থেকে নিফাসের সময়সীমা শুরু হবে।

হায়েয অবস্থায় যেসব কাজ নিষিদ্ধ যেমন, সাওম, সালাত ইত্যাদি নিফাস অবস্থায়ও নিষিদ্ধ।

পঞ্চম মাসআলা:

ইসতিহাযা তথা অসুস্থ নারীর বিধান: হায়েয বা নিফাসের সময় ব্যতীত মহিলাদের যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাকে ইসতিহাযা বলে। অতএব, হায়েয ও নিফাসের সময়সীমার আগে বা পরে অথবা হায়েয হওয়ার আগের বয়সে অর্থাৎ নয় বছরের আগে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তা সবই ইসতিহাযার রক্ত। ইসতিহাযাগ্রস্ত নারীর হুকুম হলো সে সর্বদা তারা সর্বদা ছোট অপবিত্র থাকেন, এ অবস্থা তাদেরকে সালাত, সাওম ও অন্যান্য কাজ করতে নিষেধ করে না। ইসতিহাযাগ্রস্ত নারী প্রত্যেক সালাতের জন্য অযু করবে। তার স্বামী তার সাথে সহবাস করা জায়েয।

গর্ভাবস্থায় নারী যে রক্ত দেখে তাও ইসতিহাযা হিসেবে গণ্য হবে।

ষষ্ঠ মাসআলা:

নারীর শরীরের চুল মুণ্ডন করা নিষেধ, তবে বিশেষ প্রয়োজন হলে করতে পারবে। মহিলাদের ভ্রু-প্ল্যাক (ভ্রু উৎপাটন) করা, হাতে উলকি চিহ্ন দেওয়া[1], পরচুলা লাগানো, রেত দ্বারা দাত সূক্ষ্ম করা যাতে অল্প বয়স্ক ও দাতের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। কেননা এ ধরণের কাজ যারা করে ও যারা করায় তাদের উভয়কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা‘নত করেছেন।[2] (বুখারী, মুসলিমসহ সাত কিতাবের গ্রন্থকারগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

---

[1] শরীরে সুঁই দিয়ে ফুটা করে রক্ত প্রবাহিত করা অতঃপর খতস্থানে রঙিন কিছু দিয়ে ভরাট করা।

[2] সহীহ মুসলিমে এসেছে, «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ». “মানবদেহে চিত্র অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কনপ্রার্থিণী নারী, কপাল ভুরুর চুল উৎপাটনকারিনা ও উৎপাটনকামী নারী এবং সৌন্দর্য সুষমা বৃদ্ধির মানসে দাঁতের মাঝে (সদৃশ্য) ফাঁক সৃষ্টিকারিনা, যারা আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনকারিনী, এদেরকে আল্লাহ তা’আলা লা‘নত করেন। [অনুবাদক]

নারীদের জন্য স্বামী ও অন্যান্য নারীদের মধ্যে অবস্থান ব্যতীত সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম।

সপ্তম মাসআলা:

নারীর আওরাত তথা সতর: পরপুরুষের সামনে নারীর পুরো শরীরই সতর, সুতরাং পরপুরুষের সামনে তার পুরো শরীর ঢেকে রাখা ফরয যেভাবে পরপুরুষের সাথে নির্জনে থাকা নাজায়েয।

মুহরিম ব্যতীত নারী সফর করবে না। আর মুহরিম হলো যাদের সাথে সর্বদা বিবাহ বন্ধন হারাম, তা বংশগত বা বৈবাহিক সম্পর্ক বা দুধ পানের কারণে হতে পারে।

সালাতে নারীরা তাদের চেহারা, হাতের তালু ও পা ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢেকে রাখবে। পরপুরুষের উপস্থিতিতে তাদের সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা ওয়াজিব। আর সাধারণত হাতের তালু ও পা ঢেকে রাখা মুস্তাহাব।

সতর রক্ষাকারী পোশাক ঢিলেঢালা ও ঘন হবে, পুরুষের পোশাকের সাদৃশ্য হবে না, এমন সাজ-সজ্জা হতে পারবে না যাতে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কাফিরদের জামা-কাপড়ের সাদৃশ্য হতে পারবে না এবং পোশাকটি সুনাম-খ্যাতির জন্যও হতে পারবে না।

অষ্টম মাসআলা:

নারীর সৌন্দর্য: নারীর কিছু হালাল সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য আছে, আবার কিছু হারাম সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য আছে। যেমন, নারীর জন্য সুগন্ধি, স্বর্ণ, রৌপ্য, রেশম ও কৃস্টালের জিনিস ব্যবহার করা জায়েয।

আর তাদের হারাম সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য বলতে যা সুনাম-সুখ্যাতি ও লোক দেখানোর জন্য পরে থাকে যাতে মানুষ তার দিকে তাকিয়ে থাকে, এমন সুগন্ধি যার গন্ধ গায়রে মুহরিমের কাছে পৌঁছে।

নবম মাসআলা:

নারীর আওয়াজ: সাধারণত নারীর আওয়াজ আওরাত তথা পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তাদের আওয়াজ যদি বেশি সংক্ষেপণ, নরম, মানুষকে ফিতনার আশঙ্কা ও এতে অতিরঞ্জিত হলে তা জায়েয নয়। নারীর গান করা হারাম। বর্তমান যুগে মানুষ নারীর গানে খুব আসক্ত। তারা এটাকে মানুষকে আকর্ষণ ও অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে নিয়েছে। পুরুষের জন্য গান গাওয়া হারাম আর নারীর জন্য তা কঠোরভাবে হারাম। তবে শুধু নারীদের মধ্যে আনন্দ উৎসবে শরী'আতসম্মত ও মিউজিক ছাড়া বৈধ শব্দের গান করা জায়েয।

দশম মাসআলা:

নারীদের জন্য ছোট বাচ্চাদের ও তাদের স্বামীকে গোসল দেওয়া জায়েয। এমনিভাবে পুরুষের মতো তারাও জানাযায় অংশগ্রহণ করা জায়েয; তবে জানাযার সাথে তাদের চলা ও জানাযা বিদায় দেওয়া জায়েয নেই। তাদের কবর যিয়ারত করাও জায়েয নেই। তাদের বিলাপ, শোকগাঁথা, গালে চড় দেওয়া, জামা-কাপড় ছিড়ে ফেলা ও শরীরের চুল উৎপাটন করা নিষেধ। এসব কাজ জাহেলী যুগের কাজ এবং কবীরা গুনাহ। নারীর জন্য স্বামী ছাড়া অন্যের জন্য তিনদিনের বেশি শোক পালন করা জায়েয নেই, আর স্বামীর জন্য চারমাস দশদিন শোক পালন করা ওয়াজিব। এ সময় সে স্বামীর ঘরে বাস করবে এবং সৌন্দর্য ও সুগন্ধি পরিত্যাগ করবে। শোকের ইদ্দত পালনের সময় কোনো নির্দিষ্ট পোশাক নেই।

একাদশ মাসআলা:

নারীর অলংকার: নারীর জন্য বৈধ অলংকার যেমন সোনা, রুপা ও প্রচলিত অন্যান্য পরিধান করা জায়েয। তবে তাদেরকে এ ক্ষেত্রে অপচয় ও অহংকার পরিহার করতে হবে।

নারীর নিত্য ব্যবহৃত বা বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে পরিহিত অলংকার সোনা-রূপায় যাকাত ওয়াজিব হবে না।

দ্বাদশ মাসআলা:

স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ থেকে প্রথা অনুযায়ী দান সদকা করা জায়েয, যদি তিনি এতে সম্মত থাকেন। স্বামী যাকাতের হকদার হলে স্ত্রী তার সম্পদের যাকাত স্বামীকে দিতে পারবে। স্বামী যদি কৃপণ হয় যে, স্ত্রীর প্রাপ্য ভরণ-পোষণ আদায় করতে কৃপণতা করে তাহলে স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ন্যায়-সঙ্গতভাবে যতটুকু তার ও তার সন্তানের জন্য প্রয়োজন ততটুকু সম্পদ নেওয়া জায়েয।

ত্রয়োদশ মাসআলা:

গর্ভবতী ও দুগ্ধপানকারী নারীর সাওম পালনে নিজের ও তার সন্তানের অথবা দুজনের যেকোনো একজনের ক্ষতির আশঙ্কা করলে তাদের জন্য সাওম ভঙ্গ করা জায়েয। তারা উক্ত সাওমের কাযা আদায় করবে, ফিদিয়া দিতে হবে না। তবে তারা যদি শুধু তাদের সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করে তাহলে উক্ত সাওমের কাযা ও ফিদিয়া উভয়টি আদায় করতে হবে। আর দুগ্ধদানকারী নারীর সন্তান যদি অন্য নারীর দুধ গ্রহণ করে এবং তারা যদি দুগ্ধদানকারী নারীকে ভাড়া করতে সক্ষম হয় অথবা উক্ত সন্তানের যদি সম্পদ থাকে তাহলে তারা দুগ্ধদানকারীকে ভাড়া করবে এবং নিজে সাওম ভঙ্গ করবে না। দুগ্ধদানকারী নারীর হুকুম সন্তানের মায়ের হুকুমের মতোই।

স্বামী উপস্থিত থাকলে তার অনুমতি ব্যতীত নারীর নফল সাওম পালন করা জায়েয নেই।

চতুর্দশ মাসআলা:

স্বামী তার স্ত্রীকে ফরয হজ পালনে বাধা দেওয়ার অধিকার নেই। স্ত্রী স্বামীর অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া এবং তার ফরয হজ পালনে সহযোগিতা করা স্বামীর জন্য ফরয। তবে নফল হজের ক্ষেত্রে স্বামী কোনো অসুবিধা দেখলে বা তার সন্তানের অসুবিধা দেখলে স্ত্রীকে নিষেধ করার অধিকার আছে।

পঞ্চদশ মাসআলা:

মহিলারা ইহরাম অবস্থায় তাদের স্বাভাবিক পোশাকই পরিধান করবে। তবে ইহরাম অবস্থায় নিম্নোক্ত বিষয় পরিহার করবে। তা হলো:

১- সুগন্ধিযুক্ত কাপড়।

২- হাতমোজা পরিধান করা।

৩- নিকাব পড়া।

৪- হলদে কাপড় পরিধান করা।

ষোড়শ মাসআলা:

হায়েয ও নিফাসগ্রস্তরা গোসল করে ইহরামের কাপড় পরিধান করবে, তবে তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করবে না।

সপ্তদশ মাসআলা:

হজে তালবিয়্যাহ শরী‘আতসম্মত। এতে পুরুষেরা উচ্চ আওয়াজে তালবিয়্যাহ বলবে আর নারীরা আস্তে আস্তে বলবে। নারীরা তাওয়াফ ও সা‘ঈর সময় রমল তথা হেলেদুলে চলবে না। দো‘আ পড়ার সময় উঁচু আওয়াজে দো‘আ পড়বে না। হাজরে আসওয়াদ ও অন্যান্য ভিড়ের স্থানে ভিড় করবে না।

অষ্টাদশ মাসআলা:

মাথা মুণ্ডানো ও চুল ছোট করা হজ ও উমরা একটি বিধান। তবে মহিলারা মাথা মুণ্ডানোর পরিবর্তে মাথার চুল ছোট করবে; কেননা তাদের জন্য মাথা মুণ্ডানো জায়েয নেই।

তারা চুলে বেণী করলে প্রত্যেক বেণী থেকে এক আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ কেটে ছোট করবে, আর বেণী না করলে পুরো চুলের আগা থেকে এক আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ ছোট করবে।

উনবিংশ মাসআলা:

নারীর জন্য কুরবানীর দিনে দ্রুত তাওয়াফে ইফাদা করা মুস্তাহাব; যদি তাদের

হায়েয শুরু হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা মহিলাদের হায়েযের আশঙ্কায় কুরবানীর দিনেই তাদেরকে তাওয়াফে ইফাদা সেরে ফেলতে নির্দেশ দিতেন। হায়েযগ্রস্তরা মক্কা থেকে হায়েয অবস্থায় বের হলে তাওয়াফে ইফাদা আদায় করলে তাদের বিদায়ী তাওয়াফ নেই।

বিশতম মাসআলা:

মুসলিম নারীকে অমুসলিম পুরুষের সাথে বিবাহ দেওয়া হারাম, চাই সে মুশরিক হোক বা সমাজতান্ত্রিক বা হিন্দু বা অন্য ধর্মের অনুসারী বা আহলে কিতাব; কেননা নারীর ওপর পুরুষের দায়িত্ব-কর্তৃত্ব রয়েছে এবং স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর ওপর ফরয। আর এটি অভিভাবকত্বের অর্থে। অথচ যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাহ ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাক্ষ্য দেয় তার ওপর কোনো কাফির বা মুশরিকের কোনো অভিভাবকত্ব ও কর্তৃত্ব নেই।

একবিংশ মাসআলা:

ছোট শিশু বা নির্বোধ বালক বালিকার লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষেণকে হাদানা বা নার্সারি বলে।

ছোট শিশু বা নির্বোধ বালক বালিকার লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষেণ করা মায়ের দায়িত্ব। তিনি এ কাজ করতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে এ কাজে বাধ্য করা হবে। মায়ের অবর্তমানে এ কাজের অধিক হকদার সন্তানের নানী, অতঃপর মায়ের দিকের নিকটতম মায়েরা, অতঃপর বাবা, অতঃপর বাবার মায়েরা (দাদীরা), অতঃপর দাদা, অতঃপর দাদীরা, অতঃপর সহোদর বোনেরা, অতঃপর বৈপিত্রীয় বোনেরা, অতঃপর বৈমাত্রীয় বোনেরা, অতঃপর চাচারা, অতঃপর ফুফুরা, অতঃপর খালারা, অতঃপর চাচীরা, অতঃপর ভাইয়ের মেয়েরা, অতঃপর আপন চাচাতো বোনেরা, অতঃপর বৈমাত্রীয় চাচাতো বোনেরা, অতঃপর বৈপিত্রীয় চাচাতো বোনেরা, অতঃপর নিকটতম বংশীয় আত্মীয়-স্বজনরা অতঃপর রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়রা, অতঃপর দেশের দায়িত্বরত

শাসকদের ওপর তার লালনপালনের দায়িত্ব বর্তাবে।

সন্তান লালনপালনের খরচাদি পিতাকে বহন করতে হবে। সন্তানের লালনপালনকারীর শর্ত হলো সে বালেগ তথা প্রাপ্ত বয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন, শিক্ষাদীক্ষা প্রদানে সক্ষম, আমানতদার, সচ্চরিত্রবান, মুসলিম ও অবিবাহিতা হতে হবে। তিনি বিবাহিতা হলে তার ওপর থেকে লালনপালনের দায়িত্বভার রহিত হয়ে যাবে। শিশু সাত বছর বয়স হলে (বাবা-মা আলাদা হলে) তাকে বাবা ও মা যেকোন কারে সাথে থাকার ইখতিয়ার দেওয়া হবে। শিশু যার সাথে থাকতে পছন্দ করে তাকে তার সাথে থাকার সুযোগ দিতে হবে। মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে সাত বছর পরে বিবাহ দেওয়া পর্যন্ত বাবার সাথে থাকার অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

দ্বাবিংশ মাসআলা:

চার মাযহাবের সকল আলেম একমত যে, পরপুরুষের সামনে নারীর সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা ফরয। তাদের মধ্যে যারা চেহারা ও দুহাতের তালুকে নারীর সতরের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন অথবা যারা এ অংশকে সতরের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না তারা সকলেই মনে করেন, বর্তমানে মানুষের মধ্যে ফিতনা ফাসাদ বেড়ে যাওয়ায়, দীনদারীতা কমে যাওয়ায় ও পরনারীর দিকে তাকানোর ক্ষেত্রে পরহেজগারিতা না থাকায় নারীর সমস্ত শরীরই পর্দার অন্তর্ভুক্ত ও সতর।

আমার জন্য যতটুকু সংকলন ও একত্রিত করা সম্ভব হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপরে আলোচনা করেছি। সর্বশক্তিমান সুমহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন এর দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত করেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই আমার এ কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনিই সরল সঠিক পথের পথ প্রদর্শক।

ড. সালিহ ইবন গানিম আস-সাদলান
প্রফেসর, আল-ফিকহ বিভাগ, শারী'আহ ফ্যাকল্টি
ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সা'উদ আল-ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ।